বাংলা নববর্ষ
অজানা বৈশাখ

যুবায়ের আহমদ
পরিচালক : ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১
Email- ahmadjubaer@yahoo.com

সম্পাদনায়
তারেক মুহাম্মদ শামসুল আরেফীন
মুতাওয়াল্লী : বাইতুল হাদী জামে মসজিদ
মান্ডা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১, ০১৭৯৮৪১৮১০০
www.jubaerahmad.com

পঞ্চম মুদ্রণ : মার্চ -২০১৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল-২০১৩

বাংলা নববর্ষ অজানা বৈশাখ # **লেখক:** যুবায়ের আহমদ # **প্রকাশক:** আলহাজ্ব ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী # **স্বত্ব:** পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করার শর্তে লেখকের লিখিত অনুমতিক্রমে যে কেউ বইটি প্রকাশ করতে পারবে। # **প্রচ্ছদ:** নাজমুল হায়দার #

প্রাপ্তিস্থান: ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট মান্ডা,
মুগদা, বাংলাবাজার ও দেশের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরিসমূহে।

শুভেচ্ছা মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র

উৎস্বর্গ

সম্পাদকের পিতা ও এই বই সংকলনে অংশগ্রহণ কারী
সকলের নিকট আত্মীয় যারা পরকালে আছেন
তাদের সকলের রুহের মুক্তির সদকা
হিসাবে আল্লাহ যেন কবুল
করেন। আমিন।

প্রকাশকের কথা

আমার মালিকের অপার রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের আশায় 'বাংলা নববর্ষ অজানা বৈশাখ' বইটি প্রকাশের উদ্যোগী হয়েছি।

হৃদয়ের গভীরতম কোণ থেকে একটি ক্ষীণ আশাই উৎসারিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে, যদি কোনো আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ইচ্ছায় বইটি পাঠ করে কুসংস্কৃতি ও অপচয় থেকে ফিরে আসেন এবং জাহান্নামের পথ থেকে ফিরে আসেন এবং সেই উসিলায় আল্লাহ মালিক যদি আমাকে ও লেখককে তাঁর ক্ষমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। সেই সাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও যেন মেহেরবান মালিক কবুল করেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একান্ড় অনুরোধ রইল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণগত যেসব ভুলত্রুটি রয়ে গেছে সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনা যোগ্য মনে করে এই বইটির ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকবো।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার মালিকের নিকট এই প্রার্থনাই রইলো, তিনি যেন তাঁদের সাথে আমাকে ও লেখককে তাঁর ক্ষমাযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

তালাত মোহাম্মাদ তৌফিকে এলাহী
০৪-০৪-২০১৩ ইং

ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি এই আসমান- জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র, সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন মানব জাতিকে। লক্ষ কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল মানুষের সর্বোত্তম আদর্শ, মানবতার মুক্তির দূত বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

আল্লাহপাক কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেন, "(হে মুসলিমগণ!) তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম দল, মানুষের কল্যাণের জন্য যাদের অস্তিত্ব দান করা হয়েছে। তোমারা পুণ্যের আদেশ করে থাক ও অন্যায় কাজের বাধা দিয়ে থাক এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ।" - সুরা আল ইমরান-১১০

আল্লাহপাকের এই আদেশটি আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করতে। কারণ আমি চিন্তা করলাম, আল্লাহ যদি আমাকে জিজ্ঞাস করেন, এই যুবায়ের! তোর সামনে মানুষ খারাপ কাজ করছিল, বিশেষ করে পহেলা বৈশাখে, মুসলমানের সন্তানেরা শির্ক, বেদাত, কুসংস্কৃতি ও অনৈসলামিক কার্যক্রম করছিল। তাদের অসৎ কাজ থেকে বাচানোরা জন্য কি করেছিস? এই জিজ্ঞাসার কিঞ্চিত হলেও যেন জওয়াব দেয়া যায়, আমার মুসলিম বাঙালী ভাই-বোনদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি পাঠকের সামনে পেশ করলাম।

নওমুসলিম বালিকা 'হিরার' মুসলমান হওয়ার কারণে শহিদ হওয়া এবং এ শাহাদাত তার হত্যাকারী চাচার মুসলমান হওয়ার মাধ্যম হওয়ার সত্য ঘটনাটি পুস্তিকার শেষে এ আশায় সংযুক্ত করলাম যাতে অন্তত আমাদের প্রায় মৃত মুসলিম অনুভূতিতে কিছুটা হলেও ঘা লাগে।

পুস্তিকাটি লিখতে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ করে দু একজনের নাম না নিয়েই পারছি না। তাদের মধ্যে একজন হলেন আমার বন্ধুবর জনাব মোঃ মামুনূর রশীদ সাহেব, তিনি আমাকে বইটি প্রস্তুত করতে তাগাদা দিয়ে ও তথ্য সংগ্রহ করে সহযোগিতা করেছেন এবং প্রুফ দেখে সহযোগিতা

করেছেন, আমার শ্রদ্ধেয় অন্তরঙ্গ বন্ধু আলহাজ ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলাম ও পরম শ্রদ্ধেয় বড় ভাই প্রফেসর তারেক মুহাম্মদ শামসুল আরেফীন সাহেব, মুসাদ্দেক এবং স্নেহের হাসান, ওমর, রইস, মামুন। আল্লাহ সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। এবং দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে কবুল করুন।

মানুষ হিসেবে ভুল থাকতেই পারে, যদি কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়, জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো। পরিশেষে মুনাজাত করি, হে আল্লাহ! আপনি লেখক, প্রকাশক, পাঠক-পাঠিকা সকলকে পাক্কা মুসলমান বানান এবং প্রকৃত মুসলমান হয়ে মৃত্যুবরণ করার তাওফিক দান করুন। আপনার সন্তুষ্টি ও জান্নাত দান করুন এবং দ্বীনি খেদতম আঞ্জাম দেয়ার তওফিক দিন। আমীন ॥

যুবায়ের আহমদ
০৪/০৪/২০১৩ ইং

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব	৯
পহেলা বৈশাখ	৯
ইতিহাস	১০
বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন	১১
রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা	১১
পহেলা বৈশাখের প্রায়োগিকতা	১৩
প্রথমে আমাদের আদর্শ ঠিক করতে হবে	১৪
একটি হাদীস	১৬
বর্তমান নববর্ষ পালনের আধুনিক রীতি	১৮
বিধর্মীদের পোষাকের ও প্রতীকের ব্যাবহার	১৯
খ্রিস্টানদের মতো ছেলে মেয়েদের অবাধ চলাফেরা?	২০
নারীর পর্দার অবমাননা যা ফরযের ব্যত্বয়	২২
পহেলা বৈশাখ মুসলমানদের রীতিমত পালন না করলে কে ক্ষতিগ্রস্থ হবে?	২৬
কোন ডিগ্রি নিয়ে কবরে যাব?	২৭
আপনি কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত?	২৭
মৃত্যুর পরে মুমিনের সম্মান	২৮
মৃত্যুর সময় কাফেরের অপমান	৩০
আব্দুল্লাহ ভাই-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার	৩৪

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব

শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর প্রেরিত আল্লাহর ওহীর প্রথম নির্দেশই হচ্ছে "ইক্‌রা বিসমি রব্বিকাল্লাযি খালাক" পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

-আলাক-০১

ইসলামধর্মের প্রচলনের প্রথম পদক্ষেপই তাই হচ্ছে শিক্ষিত হওয়া। উক্ত আয়াত থেকে আমরা এটাই বুঝতে পাড়ি যে, অশিক্ষিত কারো পক্ষেই ইসলামধর্মের পূর্ণ অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষিতে বর্তমান এই বইটিতে মুসলমান ভাই-বোনদের জন্য আলকুরান, হাদিস ও রাসুলের সুন্নাহএর প্রেক্ষিতে সংস্কৃতি ও সামাজিকতার গন্ডি কতটুকু হওয়া উচিৎ তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বইটি পড়ুন, অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং ইসলামধর্মের মূল ভিত্তি, রীতি নীতি সম্পর্কে জেনে সৎকাজে সহায়তা ও অসৎকাজ প্রতিহত করায় অবদান রাখুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামের শিক্ষায় সুশিক্ষিত করুন।

পহেলা বৈশাখ

বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাস বৈশাখের ১ তারিখ বাংলা সনের প্রথম দিন, তথা বাংলা নববর্ষ। এ দিনটি বাংলাদেশে এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে নববর্ষ হিসেবে বিশেষ উৎসবের সাথে পালিত হয়। আসাম ও ত্রিপুরায় বসবাসরত বাঙালিরাও উৎসবে অংশ নেয়।

বাংলা দিনপঞ্জীর সঙ্গে হিজরী ও খ্রিস্টীয় সনের মৌলিক পার্থক্য হলো হিজরী সন চাঁদের হিসাবে এবং খ্রিস্টীয় সন ঘড়ির হিসাবে চলে। এ কারণে হিজরী সনে নতুন তারিখ শুরু হয় সন্ধ্যায় নতুন চাঁদের আগমনে। ইংরেজি দিন শুরু হয় মধ্যরাতে। আর বাংলা সনের দিন শুরু হয় ভোরে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। কাজেই সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় বাঙালির পহেলা বৈশাখের উৎসব।

ইতিহাস

ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সম্রাটরা হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে কৃষি পণ্যের খাজনা আদায় করত। কিন্তু হিজরি সন চাঁদের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তা কৃষি ফলনের সাথে মিলত না। এতে অসময়ে কৃষকদেরকে খাজনা পরিশোধ করতে বাধ্য করা হত। খাজনা আদায়ে সুষ্ঠুতা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। তিনি মূলত প্রাচীন বর্ষপঞ্জিতে সংস্কার আনার আদেশ দেন। সম্রাটের আদেশ মতে তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানী ও চিন্ড়াবিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজি সৌর সন এবং আরবী হিজরী সনের উপর ভিত্তি করে নতুন বাংলা সনের নিয়ম বিনির্মাণ করেন। ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০ই মার্চ বা ১১ই মার্চ থেকে বাংলা সন গণনা শুরু হয়। তবে এই গণনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয় আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে। প্রথমে এই সনের নাম ছিল ফসলি সন, পরে বঙ্গাব্দ বা বাংলা বর্ষ নামে পরিচিত হয়।

পূর্বে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে সকল খাজনা, মাশুল ও শুল্ক পরিশোধ করতে হত। এর পরদিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকরা নিজ নিজ অঞ্চলের অধিবাসীদেরকে মিষ্টান্ন দ্বারা আপ্যায়ন করতেন। এ উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন করা হত। এই উৎসবটি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়, যার রুপ পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে এই পর্যায়ে এসেছে। তখনকার সময় এই দিনের প্রধান ঘটনা ছিল একটি হালখাতা তৈরী করা। হালখাতা বলতে একটি নতুন হিসাব খাতা বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে হালখাতা হল বাংলা সনের প্রথম দিনে দোকান-পাটের হিসাব আনুষ্ঠানিক ভাবে হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া। গ্রাম, শহর বা বাণিজ্যিক এলাকা, সকল স্থানে পুরনো বছরের হিসাব খাতা বন্ধ করে নতুন হিসাব খাতা খোলা হয়। হালখাতার দিনে দোকানদাররা তাদের ক্রেতাদের মিষ্টান্ন আপ্যায়ন করে থাকে। এই প্রথাটি এখনও অনেকাংশে প্রচলিত আছে, বিশেষত স্বর্ণের দোকানে।

আধুনিক নববর্ষ উদ্‌যাপনের খবর প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৭ সালে। প্রথম মহাযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে সে বছর পহেলা বৈশাখে হোম কীর্ত্তণ ও পূজার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর ১৯৩৮ সালেও অনুরূপ কর্মকান্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে ১৯৬৭ সনের আগে ঘটা করে পহেলা বৈশাখ পালনের রীতি তেমন একটি জনপ্রিয় হয়নি।

বাংলাদেশে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন

আমাদের দেশে নতুন বছরের উৎসবের সঙ্গে রয়েছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিবিড় যোগাযোগ। এদিনে গ্রামের মানুষ ভোরে ঘুম থেকে উঠে, নতুন জামাকাপড় পড়ে এবং আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে বেড়াতে যায়। বাড়ি-ঘর সুন্দর করে সাজায়। বিশেষ খাবারের ব্যবস্থাও করে। আয়োজন করা হয় বৈশাখী মেলার। মেলাতে থাকে নানা রকম কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর বিপনন, থাকে নানরকম পিঠা-পুলির আয়োজন। অনেক স্থানে ইলিশ মাছ দিয়ে পান্ড়া ভাত খাওয়ার ব্যবস্থাও থাকে। এই দিনে একটি পুরনো সংস্কৃতি হলো গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন।

রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ ও মঙ্গল শোভাযাত্রা

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে পহেলা বৈশাখের মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন হলো সাংস্কৃতিক সংগঠন ছায়ানট-এর গানের মাধ্যমে নতুন বছরের সূর্যকে আহ্বান জানানো।

পহেলা বৈশাখে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ানটের শিল্পীরা সম্মিলিত কণ্ঠে গান গেয়ে নতুন বছরকে আহ্বান জানান। স্থানটির পরিচিতি বটমূল হলেও প্রকৃত পক্ষে যে গাছের ছায়ায় মঞ্চ তৈরি হয়, সেটি বটগাছ নয়, অশ্বত্থ গাছ। ১৯৮৯ সাল থেকে এই মঙ্গল শোভাযাত্রা পহেলা বৈশাখের উৎসবের একটি অন্যতম আকর্ষণ। ঢাকার বৈশাখী উৎসবের একটি আবশ্যিক অঙ্গ হলো মঙ্গল শোভাযাত্রা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে পহেলা বৈশাখ সকালে এই শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় চারুকলা ইনস্টিটিউটে এসে শেষ হয়। বিভিন্ন ভাবে বলা হয় এই শোভাযাত্রা আবহমান বাংলার গ্রামীন জীবন এর রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস। তাই এই শোভাযাত্রায় সকল শ্রেণী-পেশার বিভিন্ন বয়সের মানুষ অংশগ্রহণ করে। শোভাযাত্রার জন্য বানানো হয় রঙ-বেরঙের মুখোশ বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিলিপি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন প্রাণীর বিশেষ করে পেঁচা, ময়ুর ও অন্যান্য বিকট প্রাণীর প্রতিলিপি নিয়ে মিছিল করাই সার।

ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা পহেলা বৈশাখ উদযাপনে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। নববর্ষ উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন পাড়ার অলিতে গলিতে নানা সংগঠনের উদ্যোগে

প্রভাতফেরি আয়োজিত হয়। বিগত বছরের চৈত্র মাসে শহরের অধিকাংশ দোকানে ক্রয়ের উপর দেওয়া হয়ে থাকে বিশেষ ছাড়, যার প্রচলিত কথ্য নাম "চৈত্র সেল"। তাই পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে এবং এই ছাড়ের সুবিধা গ্রহণ করতে অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে কলকাতার সমস্ড় মানুষ একমাস ধরে নতুন জামাকাপড়, ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। পহেলা বৈশাখের দিন উল্লেখযোগ্য ভিড় চোখে পড়ে কলকাতার বিখ্যাত কালীঘাট মন্দিরে। সেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ভোর থেকে প্রতীক্ষা করে থাকেন দেবীকে পূজা নিবেদন করে হালখাতা আরম্ভ করার জন্য। ব্যবসায়ী ছাড়াও বহু হিন্দু পরিবারের মঙ্গল কামনা করে দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে কালীঘাটে গিয়ে থাকেন। এইদিন বাঙালির ঐতিহ্যবাহী পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবি এবং শাড়ি পরার রেওয়াজ প্রচলিত।

কিছু তথাকথিত স্বঘোষিত সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবী তাদের অনুষ্ঠানকে আমাদের দেশের সংস্কৃতির সাথে এক করে দেখতে গিয়ে ভুলে গেছেন এ দেশের ধর্ম, মূল্যবোধ ও সভ্যতাকে। তারা মুসলমান হয়েও এটা দেখতে ভুলে গেছেন যে, এসব আমাদের ৯০ শতাংশ ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষের বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক কি না। অথচ আজ আমরা তথাকথিত উদারতা, অসাম্প্রদায়িকতার নাম করে সার্বজনীনতার দোহাই দিয়ে নিজেরাই নিজেদের সাথে ধোঁকাবাজি করছি। আর এসব কথা তুলে ধরলে অনেকেই চেঁচিয়ে উঠে বলেন ও ধর্মকে সব জায়গায় আনবেন না। এসব বাঙালি রীতি। বৈশাখকে বরণ করার সাথে ধর্মের সাংঘর্ষিকতা কোথায়? সবাই করে তাই করি। এতে আমার কোনো ধর্মীয় যোগসূত্র নেই। সত্য হলো– আমাদের দেশের বেশির ভাগ মুসলমানের কাছে ধর্ম শুধু নামাজ আর দোয়া-দুরুদ পর্যন্ড় সীমাবদ্ধ। তাই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ আজো বাংলাদেশের মাটিকে স্পর্শ করেনি। আর তাই কোনো ঋতুকে মঙ্গল মনে করে তাকে ডাকতেও আমাদের সমস্যা হয় না। যদিও আমাদের মুসলমানদের নূন্যতম এই জ্ঞান থাকা উচিত যে, কোনো ঋতু কখনো মঙ্গল হতে পারে না। বরং সেই ঋতু বা সময় আমাদের জন্য যাতে মঙ্গল হয় তার জন্য শুধু আল্লাহকেই স্মরণ করা যায়। আর তার মঙ্গল হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট গাছের নিচে নয় বরং ঘরের কোণে বসলেও সমস্যা নেই।

পহেলা বৈশাখের প্রায়োগিকতা

পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন, এইদিনে মানুষ বিগত বছরের হিসাব নিকাশ করে। এ লক্ষ্যেই শুরু হয়েছিল বাংলা নববর্ষের গণনা। এ মাসেই ব্যবসা-বাণিজ্যের হালখাতা করা হয়। বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের হিসাব নিকাশ শুরু হয় জুন মাসে। এ ছাড়া খ্রিস্টীয় সংস্কৃতি অনুসরনে ব্যাংক বীমা ও সকল ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে হিসাব নিকাস নতুন করে শুরু হয় পহেলা জানুয়ারী। আমাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে কৃষকদের ভুমিকাকে আমরা দিন দিন অনুৎসাহিত করছি তা আমাদের এই দুটো কর্মকান্ড থেকে বোঝা যায়। এই প্রেক্ষিতে উচু সমাজের মানুষের আহলাদি উৎসব মানসিকতা ছাড়া নববর্ষের কোনো প্রয়োগ নেই।

মুসলমানদের উচিত, তারা যেন বিগত বছরের আমলের হালখাতা করে। তারা আমলের হিসাব মিলাবে, বিগত বছরের নাফরমানির জন্য তওবা করবে। নতুন বছরে নতুনভাবে আমল শুরু করবে। জানি না কখন কার মৃত্যুর ডাক এসে যায়, যার জন্যে প্রস্তুত থাকবে। প্রতিজ্ঞা করবে নতুন করে আমল শুরু করার।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, আমরা এই নববর্ষের শুরু থেকেই মেতে উঠি পাপের প্রতিযোগিতায়। ঘুম থেকে ওঠে, মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া না দিয়ে, সাড়া দিচ্ছি শয়তানের আহ্বানে। মসজিদ বাদ দিয়ে যাচ্ছি রমনা বটমূলে। কুরআন তেলাওয়াত বাদ দিয়ে, গাইছি আমরা অপসংস্কৃতির গান।

প্রিয় পাঠক! আসুন! আমরা শয়তানের অনুসরণ পরিহার করে; আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করি। নববর্ষ থেকে শিক্ষা নিই, নতুন করে আমল শুরু করি। বিগত বছরের পাপের জন্য লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করি। আজ থেকে আমরা গুনাহ ছেড়ে দিই। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। গুনাহ থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

প্রথমে আমাদের আদর্শ ঠিক করতে হবে

আমাদের প্রথমত বিবেচ্য বিষয় আমাদের সত্বা সম্পর্কে ধারণা। আমি কি মুসলমান? যদি উত্তর হ্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমি মুসলমান কলেমা পড়ার জন্য। আর কলেমাটি হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ এক এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রেরিত রাসুল। এখন এই কলেমা পঠের মানে কি? মানে হচ্ছে আমি এক

আল্লাহর উপাসনায় বিশ্বাস করি এবং আল্লাহ ও মানুষ হিসাবে আমার জন্য নির্ধারিত সব কিছু সম্পর্কে আমি অবহিত হবো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে অর্থাৎ রাসুল কর্তৃক অবহিত করা সব কিছু আমি আল্লাহ প্রদত্ব বলে স্বীকার করে নিব এবং মান্য করব। অর্থাৎ কলেমা পড়ে এই ভাবে আমি আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ।

বিশ্বাসীদের জন্য পবিত্র আল কুরআনের ২য় আয়াতে সুস্পষ্ট করা হয়েছে কি জীবন বিধান হিসেবে মানতে হবে। " আলকুরআন সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই, এতে রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য পথের দিশা। -বাকারা ২:২

আল্লাহ তাআলা বলেন "বস্তুত রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ- এমন ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে। -সুরা আহযাব-২১

আল্লাহ তাআলা বলেন, মুসলমানদের জন্য উত্তম আদর্শ হলেন, আল্লাহর রাসুল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কিন্তু একটু চিন্ড়া করে দেখি, আমরা কাকে আদর্শ বানাই।

আফসোস! আজ নামের মুসলমানরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে আদর্শ বানায়, দুই শ্রেণীর মানুষকে। একশ্রেণী হলো, নায়ক-নায়িকা। অপর শ্রেণী হলো, খেলোয়াড়। কারণ আমার দাড়িটা কাটি, আমার পছন্দের নায়কের স্টাইলে। আমার মাথার চুল কাটি তো, সেই পছন্দের নায়ক যেই স্টাইলে চুল কাটে, আমিও সেই স্টাইলে চুল কাটি। তাই তো দেখা যায়, সেলুনে বিভিন্ন নায়কদের ছবি। অনেকে নাম বলতে না পারলেও যেন ছবি দেখে পছন্দের স্টাইলে চুল কাটে। পক্ষান্ড়রে কখনো সেলুন ওয়ালাকে বলি না যে, ভাই! আমার দাড়িটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের দাড়ির মতো রেখে দাও। কোনোদিন বলিনি, নবীর চুলের মতো আমার চুল রেখে দাও বা কেটে দাও। একটু চিন্ড়া করি, আমার পোশাক কি নবীজীর পোশাকের মতো, না খ্রিস্টানদের পোশাকের মতো? আমার লেন-দেন, চলা-ফেরা, নবীজীর মতো, না খ্রিস্টানদের মতো?

নামধারী মুসলমান ও একজন হিন্দু-খ্রিস্টানের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। যেমন,

একজন হিন্দু-খ্রিস্টান দাড়ি রাখে না, একজন মুসলমানও দাঁড়ি রাখে

না।

একজন হিন্দু-খ্রিস্টান নামায পড়ে না, একজন মুসলমানও নামায পড়ে না।

একজন হিন্দু-খ্রিস্টান রোজা রাখে না, একজন মুসলমানও রোজা রাখে না।

একজন হিন্দু-খ্রিস্টান প্যান্ট-শার্ট-টাই পরে, একজন মুসলমানও প্যান্ট-শার্ট-টাই পরে।

একজন হিন্দু-খ্রিস্টান সুদ-ঘুষ খায়, একজন মুসলমানও সুদ-ঘুষ খায়।

একজন হিন্দু-খ্রিস্টান ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, একজন মুসলমানও ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ।

একজন হিন্দু-খ্রিস্টান কুরআন পড়তে জানে না, একজন মুসলমানও কুরআন পড়তে জানে না।

একজন হিন্দু-খ্রিস্টান ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে, একজন মুসলমানও ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে ইত্যাদি। পুস্ড়কটির কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে এখানে কয়েকটি উদাহরণ দিলাম। আসুন! আমরা একটু চিন্ড়া-ভাবনা করি যে, কোন কোন জিনিসের মধ্যে নবীর সাথে আমার মিল আছে।

এবার একটু চিন্ড়া করি, আমরা কেমন মুসলমান? আমরা কাকে আদর্শ বানাই।

আমাদের মুসলমান মা বোনদের আদর্শ ছিল, ফাতেমাতুয যহরা রা., উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.। কিন্তু আমার মা বোনেরা আদর্শ করে নিয়েছে সমাজের খারাপ ও বেহায়া নারী নায়িকাদেরকে, যারা পর পুরুষের সাথে অশণ্টীল আচরণ করে।

তাইতো দেখা যায়, আমার মা-বোনেরা থ্রী-পিসটি ক্রয় করে পছন্দের নায়িকাদের মতো। চোখের ভ্রু কাটে, মেকাপ পরে, চুল কাটে, পছন্দের নায়িকার স্টাইলে। হিন্দু-খ্রিস্টানদের মতো টাইট, পাতলা কাপড়ের অশালীন পোশাক পরে। হিন্দু-খ্রিস্টানদের মতো, বে-পর্দা চলা-ফেরা করে। এমনভাবে চলে মনে হয়, পর্দা যে একটি ফরয বিধান এটা জানেই না। নামায যেমন ফরজ পর্দা তেমনিই ফরজ। হে আল্লাহ! মা বোনদেরকে হেফাজত করুন, আমিন।

একটি হাদিস

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- " যে ব্যক্তি যেই জাতীর সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের অন্ড়র্ভুক্ত। "

-আবু দাউদ শরীফ, পোশাক অধ্যায়- মিশকাত শরীফ পৃ.৩৭৩

প্রিয় পাঠক! একটু কি চিন্ড়া করেছি আমাদের সাদৃশ্য কাদের সাথে? অবশ্যই অমুসলিমদের সাথে। তারা চিরকালের জাহান্নামে যাবে। আমাদেরকেও তাদের সাথে চিরকাল জাহান্নামে জ্বলতে হবে তাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা জন্য। আপনি কি হিন্দু-খ্রিস্টানদের অন্ড়র্ভুক্ত হয়ে জাহান্নামে যেতে চান? যদি না চান, তাহলে এখনই তওবা করুন এবং প্রতিজ্ঞা করুন যে, আজ থেকে অমুসলিমদের অনুসরণ করবেন না এবং তাদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করবেন না।

আমাদের পরিচয় কী?

আল্লাহ তাআলা বলেন - "তার চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে, আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন।" -হা-মীম সাজদা-৩৩

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নিজেকে মুসলমান বলে, ঘোষণা করতে যে, আমি মুসলমান। কিন্তু আফসোস, আজ আমরা নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি। কিন্তু আমাদের আমল পরিচয় দিচ্ছে, আমি একজন হিন্দু বা খ্রিস্টান।

প্রিয় পাঠক! আসুন আমরা নিজেদেরকে জানি, এবং নিজেদেরকে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করি। মুসলমান হিসেবে আমলের মাধ্যমে নিজের পরিচয় দিই যে, আমি একজন মুসলমান।

অন্যধর্মের অনুকরণ বর্জন করতে হবে

এবার কোনো নামধারী মুসলমান ভাই প্রশ্ন করতে পারেন যে, আমরা বাঙ্গালী, এসব বাঙ্গালীদের ঐতিহ্য, তাহলে আমরা কি আমাদের বাঙ্গালী ঐতিহ্য বাদ দিব? বাঙ্গালী সংস্কৃতি বর্জন করব? চলুন এবার একটু বিশেণ্টষণ করি- ধরি আমি একজন মুসলমান, এখন আমি যদি প্রতি

খ্রিস্টমাসের দিন যদি সবাইকে উপহার প্রদান করি, সান্ড়ার মতো অথবা দূর্গা পুজায় যদি পুজা-মন্ডপের সামনে করজোরে প্রণাম করি তাহলে কি আমি মুসলমানের দাবী পুরণ করি? বা দশজনকি আমাকে মুসলমান বলবে। ঠিক একি ভাবে যদি কোনো বিধর্মী মসজিদে আসা শুরু করে তবে কি তাকে কেউ বিধর্মী বলবে? ধরলাম এইরকম একজন বিধর্মী যদি মসজিদে আসতে থাকে তাকে আমরা মুসলমানরা কি তাড়িয়ে দিবো? বরং তাকে আমরা উৎসাহ দিব। ঠিক এমনি ভাবে অন্যের রীতি যদি আমরা পালন করতে থাকি তাহলে অন্যরা নিশ্চই আমাদেরকে উৎসাহ দিবে।

আসুন! আমরা আমাদের ধর্ম বুঝি। নববর্ষ আমরা আমাদের জীবনে দেখেছি, কিন্তু বুঝার চেষ্টা কি করেছি? ধরা যাক হযরত ইবরাহীম আ. ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর জীবনী, উনারা যদি উানাদের বাপদাদার পালিত রীতি শুনেই পালন করতেন এবং নিজে থেকে না বুঝার চেষ্টা করতেন, তাহলে কি এই দ্বীন ইসলাম এবং মুসলমান জাতির উদ্ভব ঘটত ? তাই আসুন নিজেই এর বিশেণ্ঢষণ বের করি।

বর্তমান নববর্ষ পালনের আধুনিক রীতি

মঙ্গলযাত্রা : বৈশাখী উৎসবের একটি আবশ্যিক অঙ্গ মঙ্গলযাত্রা, মঙ্গলযাত্রা কি ইসলামী সংস্কৃতি? এটা বাঙ্গালী সংস্কৃতিও না, এটা স্পষ্ট একটি হিন্দুয়ানী ও শিরকী সংস্কৃতি। আজ আমরা তাদের অনুসরণ করতে গিয়ে এটাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দিয়েছি।

আমরা অনেকে বিশ্বাস করি, এই মঙ্গলযাত্রা আমাদের মধ্যে মঙ্গলের বার্তা নিয়ে আসবে। পহেলা বৈশাখের উদ্দেশ্য ও বর্ণনায় বলা হয় গ্রাম বাংলার আবহমন চিত্র ফুটিয়ে তোলা। এখন মঙ্গল শোভাযাত্রা গ্রাম বাংলায় আদও ছিল কি? মঙ্গল শোভাযাত্রায় পেঁচা, ময়ূর ও বিভিন্ন বিকৃত মুখোশ যা মুর্তিরই নামান্ড়র নিয়ে মিছিল করা। এটা ভারতীয় সনাতন ধর্মাবলম্বী দাবীদারদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মৌলবাদী সংস্কৃতির প্রতি ফলন। তারা ধারণা করে পেঁচা ও বিভিন্ন বিকট মুখোশ গুলো সব অমঙ্গলের প্রতিচ্ছবি। বছরের প্রথম দিনে এদেরকে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করলে তারা খুশি হবে এবং সারা বছর তারা এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রীদেরকে আর উৎপাত করবে না। নাউযুবিল্লাহ। এবার আপনিই চিন্ড়া করেন আসলে এই বিশ্বাসটাও

মুসলমানদের নয়, কারণ মুসলমানরা বিশ্বাস করে আমাদের মঙ্গল করতে চাইলে একমাত্র আল্লাহই করতে পারেন এবং অমঙ্গল করতে চাইলে, তাও একমাত্র এক আল্লাহই করতে পারেন। অন্য কেউ নয়। অন্য কোনোভাবেও নয়। কোনো শোভাযাত্রার মাধ্যমে নয়, কোনো প্রদীপ জ্বালিয়েও নয়। চিন্ড়া করে দেখুন তো আসলেই কি এই সকল কর্মকা- আমাদের কোনো মঙ্গল-অমঙ্গল কিছু দিতে পারবে? না! এক আল্লাহই পারেন– "পরবর্তী ও গুরুবর্তী সব মঙ্গলই একমাত্র আল্লাহরই হাতে।"

-সূরা নাজম-২৫

এটা আল্লাহর একক স্বত্তা বা তাওহীদের একটি গুণ। এর সাথে অন্য কিছু সংযোজন হলো "শিরক"। আমরা "মঙ্গল শোভাযাত্রার" নামে, শোভাযাত্রা করে মঙ্গল আনতে চেয়ে আমরা কিন্তু স্পষ্টভাবে "শিরক"ই করে ফেলছি, জেনে বা না জেনে। আর এর মাঝে হাতি, ঘোড়া সহ অন্যান্য প্রাণীর মূর্তি, মুখোশ বা অবয়ব এনে তাকে আরো "বড় শিরক" করে ফেলছি... ভালো মন্দের প্রতীক তৈরী মানেই কিন্তু শিরক।

আমাদের এ ধরনের বিশ্বাস শির্ক। আর শির্ক সম্পর্কে আল্লাহতাআলা বলেন, "যে কেউ রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তার কাছে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পর এবং সব মুসলমানের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে, আমি তাকে ওই দিকেই ফেরাব, যে দিক সে অবলম্বন করেছে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা নিকৃষ্টতর গন্ড়ব্যস্থল।" -সুরা আন্-নিসা:৪:১১৫

"লাত-উজ্জা" (যা আরবের মুশরিকরা পুজা করত) এগুলোও প্রাণীর অবয়বে "ভালো মন্দের" প্রতীকী মূর্তি ছিল। রাসূল (সা.) সেগুলো কিন্তু নিজ হাতে ভেঙ্গেছিলেন... নিজ হাতে...!! আপনি হয়তো ভাবছেন, সব বন্ধুরা যাবে, আর আমি যাবো না এটা হয় কিভাবে? মনে রাখবেন- আপনার জান্নাত জাহান্নাম আপনার কাছে, তখন কিন্তু বন্ধুদের পাবেন না! "বন্ধুবর্গ সেদিন একে অপরের শত্র- হবে, তবে খোদাভীরুরা নয়।" -আয-যুখরুফ : ৬৭

এই গুনাহ কিন্তু মাফ হওয়ার নয় এই এক গুনাহই যথেষ্ট আপনাকে জাহান্নামে নিতে।

বিধর্মীদের পোষাকের ও প্রতীকের ব্যাবহার

পোষাক মানুষের সত্বার বহিঃপ্রকাশ। আসুন আমরা পোষাকের গুরুত্ব অনুধাবন করি। প্রত্যেক দেশের জাতীয় পোষাক রয়েছে কেন? বিভিন্ন খেলায় দুটি দল কেন ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পড়ে? পুলিশ ও আর্মির কাজ কর্ম পৃথক সেই জন্য কি তাদের পোষাকও পৃথক নয়? একজন মুসলমান একাত্ববাদীর পোষাকও ভিন্ন হবে বিধর্মী থেকে। এটাই কি সাভাবিক নয়? অন্যধর্মের পোষাক ও প্রতীক পরিধান করে কোনোভাবেই অন্যের অনুকরণ তার জন্য যায়েজ নয়।

আমরা মুসলিম বাঙ্গালী, হিন্দু বাঙ্গালী নই। মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে, যা আল্লাহপ্রদত্ব। অমুসলিমদের থেকে মানবরচিত ইসলাম বিরোধী সংস্কৃতি আমাদের ধার করার প্রয়োজন নেই। আফসোস! আজ আমরা নিজেদেরকে ভুলে গেছি, হারিয়ে ফেলেছি আত্মমর্যাদাবোধ। নিজেদের ঐতিহ্য ও অস্ড়িত্বকে দাফন করে অনুসরণ করছি হিন্দুদের ধর্মীয় সংস্কৃতি। পহেলা বৈশাখে দেখা যায়, আমাদের মুসলমান যুবক ভাইয়েরা, পায়জামা সিস্টেমে ধুতি পরে। আর আমার যুবতী বোনেরা পরে শাখা সিঁদুরের রঙের সাদা লাল কাপর, যার দ্বারা বুকের বিশেষ অংশ দৃষ্টিগোচর হয়, আর পেট থাকে অনাবৃত। পুরুষের জন্য ধুতি ও মহিলাদের জন্য শুধু কাপড় পরে, বাহিরে পর পুরুষের সামনে বের হওয়া ইসলামী সংস্কৃতি নয়; বরং হিন্দু-খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি। মুসলমান মেয়েদের সংস্কৃতি হলো, বাহিরে বের হলে পুরো শরীর ঢেকে, পর্দা করে বা বোরকা পরে বের হবে। এর মধ্যেই রয়েছে নারীর নিরাপত্তা ও শান্ড়ি। নারীর মর্যাদা ও অধিকার।

শাখা-সিঁদুর কাদের প্রতীক? কাদের সংস্কৃতি? আমি কেমন মুসলমান যে, হিন্দুদের এই ধর্মীয় প্রতীক গ্রহণ করে গর্ববোধ করছি? আমি কেমন মুসলমান কখনো কি ভেবেছি? একটু চিন্ড়া করেছি?

আসুন! হিন্দুদের প্রতীককে বর্জন করে ইসলামী প্রতীক গ্রহণ করি। অনৈসলামী সংস্কৃতি থেকে বিরত থাকি। জাহান্নামের পথ ছেড়ে জান্নাতের পথ ধরি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

খ্রিস্টানদের মতো ছেলে মেয়েদের অবাধ চলাফেরা

ছেলে মেয়েদের অবাধ চলাফেরা, অশণ্টীলতা আর বেহায়াপনা, যা পহেলা বৈশাখে আমরা দেখতে পাই। এটা কোনো মুসলমানের সংস্কৃতি হতে পারে না। এটা ইয়াহুদী, খ্রিস্টান ও হিন্দুদের সংস্কৃতি। এর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। এতে নারী শিকার হয় ইভটিজিং ও ধর্ষণের। ফলে নারী হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীনতা। বিলিন হয়ে যায় তার ইজ্জত-সম্মান। পত্রিকা খুললে এমন কোনোদিন পাওয়া যায় না, যেদিন বাংলাদেশে ধর্ষণের কোনো খবর না থাকে। তবে ধর্ষণের শিকার হয় তারাই, যারা অবাধ খোলামেলা চলাফেরা করে, যারা ইসলামী সংস্কৃতি বাদ দিয়ে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি গ্রহণ করে।

যেমন, ভারতে নারীরা গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে, এটা তাদের হাতেরই কামাই। কারণ তাদের চলা-ফেরা খুবই অশণ্টীল, অরুচিকর পোশাকাদি, যা যৌনতার দাওয়াত দেয়, ফলে যুবকরা সেই দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য গণহারে যোগ দেয়। লোভ সামলাতে না পেরে, পাবলিক পরিবহনে জন সম্মুখেই দাওয়াতে অংশ নেয়। তারা অশালীন ও অশণ্টীল পোশাকে চলতে পারে, কারণ তাদের ধর্মে এর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই এবং শালীনতার শিক্ষাও নেই। কিন্তু মুসলমানেরা কিভাবে তাদের অনুসরণ করে? ইসলাম শালীনতা শেখায়, শৃঙ্খলা শেখায়, ইসলামে চলা-ফেরায় বিধি নিষেধ আছে। যারা ইসলামের বিধি নিষেধ মানে, তারা সম্মান ও নিরাপদে থাকে। বোরকা পরা নারীর ধর্ষণের খবর পাওয়া যায় না। কেননা তারা আল্লাহর হুকুম পালন করে, তারা ইসলামী সংস্কৃতি অবলম্বন করে।

আফসোস! আজ নারী-পুরুষ উভয়ে একত্রে পর্দার বিধানকে অমান্য করে নাচগান পরিবেশন করছে। অশণ্টীলতা, বেহায়াপনা ও অপচয়ের শিকার হচ্ছে। এর পরিণাম কিন্তু খুবই ভয়াবহ। আল্লাহতাআলা সুরা আনআম এর ১২৯ নং আয়াতে বলেন- "নির্লজ্জতা ও অশ-ীলতার কাছেও যেও না, চাই তা প্রত্যক্ষ হোক আর পরোক্ষ হোক।"-আনআম-১২৯ ইসলামী বিধি-বিধান না মানার কারণে যে সব ক্ষতি বা বিপদ আসে, এ তো হলো দুনিয়ার সাময়িক কষ্ট ও বিড়ম্বনা। কিন্তু আখেরাতে আছে কঠিন শাস্ড়ির ব্যাবস্থা। দুনিয়ার কষ্ট সহ্য হয়, কিন্তু চিরস্থায়ী আযাব সহ্য হবে না। মৃত্যুর পর থেকে শুরু হবে কঠিন শাস্ড়ি।

আসুন! আমরা অবাধ চলাফেরা বর্জন করি। অশণ্টীলতা পরিহার করি।

হিন্দু-খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি ত্যাগ করি। ইসলামী সংস্কৃতি পালন করি। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করি। চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি লাভ করি।

আসুন! প্রস্তুতি গ্রহণ করি, মৃত্যুর, পরকালের, কবরের, হাশরের, বিচার দিবসের, সর্বোপরি জান্নাতের। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন। আমিন।

বিধর্মীদের মতো গান বাজনা

পহেলা বৈশাখে আমরা দেখতে পাই, রমনা বটমূলে ও বিভিন্ন স্থানে নারী-পুরুষ এক সাথে নাচ-গান করে। আনন্দ-ফূর্তি করে নববর্ষ উদ্‌যাপন করে। এটা কোনো মুসলমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হতে পারে না। এটাও বিধর্মীদের সংস্কৃতি। তারা যে কোনো অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে, ঢোল, তবলা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যবহার করে নাচ-গান করে থাকে। আফসোস! আজ মুসলমানের সন্ড়ানেরা মুসলমান দাবি করে, কিন্তু অনুসরণ করে বিধর্মীদের। শুধু পহেলা বৈশাখেই নয়, বরাবরই আমরা হিন্দুদের উৎসব উদ্‌যাপন করে আসছি। দেখুন, দূর্গা পূজায় মুসলমানরা ভিড় জমায়, অবস্থা দেখে মনে হয়, মুসলমানদের উপস্থিতি না থাকলে তাদের পূজাই হবে না। কিন্তু আপনি কি কোনোদিন দেখেছেন, মুসলমানদের কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হিন্দুরা এসেছে? দুই ঈদের নামাযে কি তারা উপস্থিত হয়? জুমার নামাযে কি তারা আসে? যদি বলেন, 'না' তাহলে আমরা কোন লজ্জায় তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিই। আমাদের কি একটুও আত্মমর্যাদা বোধ নেই? আমাদের কি একটু লজ্জাও নেই? আসুন! আমরা তাদের এই গান-বাজনার সংস্কৃতি বর্জন করি। তাদের অনুসরণ ত্যাগ করি। জাহান্নাম থেকে বাঁচি; জান্নাতের পথ সুগম করি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করি।

নারীর পর্দার অবমাননা যা ফরযের ব্যত্বয়

আমাদের দেশে কিছু মানুষ প্রশ্ন তোলে, নারীরা পর্দা করবে কেন? তারা বোরকার ভিতরে আবদ্ধ থাকবে কেন? অমুসলিমদের সাথে মুসলমান নামে কিছু অমুসলিমরা শেণ্ঢাগান তুলে, ইসলাম নারীদেরকে পর্দার শিকলে

বেঁধে রেখেছে। কোনো মুসলমান এ ধরনের চিন্ড়া লালন করতে পারে না এবং বিশ্বাসও করতে পারে না। কারণ মুসলমান মানেই হলো, পরিপূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা। যদি আনুগত্য স্বীকারই করে নেয়, তাহলে আবার আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে কি করে? যাক আসল কথায় ফিরে আসি।

আপনি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে ভিন্ন ঘরে বাস করেন কেন? একই পরিবারের লোকজন পৃথক ঘরে বাস করে কেন? বিভিন্ন পাবলিক স্থানে (বাস স্ট্যান্ড, মার্কেট) মেয়েদের জন্য আলাদা ওয়াস রুমের ব্যবস্থা কেন? ছাত্র ও ছাত্রীবাস আলাদা কেন? অর্থাৎ পর্দা হচ্ছে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা। এখন সেই আপনিই আপনার প্রিয় মানুষটিকে সারা পৃথীবীর সামনে কেন প্রকাশ করবেন? যৌন উত্তেজক হিসেবে আপনি কি আপনার সঙ্গীনীকে দিয়ে অন্যদেরকে সুরসুরি দিতে চান?

পর্দা কি শুধু নারীরাই করবে? না পুরুষদেরও করতে হবে? দেখুন আল্লাহ তাআলা সুরা নুরের ৩০নং আয়াতে বলেন "মুমিন পুরুষদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য উৎকৃষ্ট পন্থা। তারা যা-কিছু করে আল্লাহ সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত।"

আসুন! এবার একটু চিন্ড়া করি, আমি আল্লাহর আনুগত্য স্বীকারকারী মুসলিম হিসাবে তাঁর এই হুকুম পালন করছি? আমরা কি দৃষ্টি অবনত ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করছি? যদি হেফাজত করতাম, তাহলে পহেলা বৈশাখে, অর্ধউলঙ্গ মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করতাম না এবং গার্ল ফ্রেন্ডদের সাথে রমনা পার্কে লজ্জাস্থানের অবৈধ ব্যবহার করতাম না।

আল্লাহ তাআলা সুরা নুরের ৩১নং আয়াতে বলেন, "এবং মুমিন নারীদের বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং নিজেদের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে, যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া এবং তারা যেন তাদের ওড়নার আঁচল নিজ বক্ষদেশে নামিয়ে দেয় এবং নিজেদের ভূষণ (যে সকল পুরুষের সামনে নারীর পর্দা রক্ষা জরুরী নয়, এবার তাদের তালিকা দেয়া হচ্ছে) যেন স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাতিজা, ভাগিনে, আপন নারীগণ (যাদের সঙ্গে মেলামেশা হয়ে থাকে) যারা নিজ মালিকানাধীন, (দাসীগণ, চাকরানী নয়) যৌনকামনা জাগে না এমন

খেদমতগার এবং নারীদের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া আর কারও সামনে প্রকাশ না করে। মুসলিম নারীদের উচিত ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ জানা হয়ে যায়। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর। ”-সুরা নুর-৩১

এই আয়াতের শুরুর দিকে বলা হয়েছে, ‘নিজের ভূষণ অন্যদের কাছে প্রকাশ না করে’ মুফাসসিরগণ বলেন, এখানে ভূষণ দ্বারা শরীরের সেই অংশ বোঝানো হয়েছে, যাতে অলংকার বা আকর্ষণীয় পোশাক পরিধান করা হয়। এভাবে এ আয়াতে নারীদেরকে হুকুম করা হয়েছে তারা যেন গায়রে মাহরাম বা পরপুরুষের সামনে নিজেদের গোটা শরীর বড় চাদর বা বোরকা দ্বারা ঢেকে রাখে, যাতে তারা তার সাজসজ্জার অঙ্গসমূহ দেখতে না পায়। তবে শরীরের এ রকম অংশ যদি কাজকর্ম করার সময় আপনিই খুলে যায় বা বিশেষ প্রয়োজন বশত খোলার দরকার পড়ে, তাতে গোনাহ হবে না। সে সম্পর্কে বলা হয়েছে যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া। ইবনে জারীর তাবারী রহ. তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নারী যে চাদর দ্বারা শরীর ঢাকে, এ ব্যতিক্রম দ্বারা সেটাই বোঝানো উদ্দেশ্য, যেহেতু তা আবৃত করা সম্ভব নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. ব্যাখ্যা করেন, বিশেষ প্রয়োজনে যদি চেহারা বা হাত খুলতে হয়, তবে এ আয়াত তার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু চেহারাই যেহেতু রূপ ও সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল তাই সাধারণ অবস্থায় তা ঢেকে রাখতে হবে, যেমন সুরা আহযাবে হুকুম দেয়া হয়েছে, (৩৩:৫৯)। হ্যাঁ, বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা। তখন চেহারাও খোলা যাবে, কিন্তু পুরুষের প্রতি নির্দেশ হলো, তখন যেন সে দৃষ্টি অবনমিত রাখে, যেমন এর আগের আয়াতে গেছে।

-তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন-২য় খন্ড, ৪২৯

প্রিয় পাঠক! এখানে আল্লাহতাআলা নারীদেরকে হুকুম দিয়েছেন, তাদের অঙ্গকে ঢেকে রাখার জন্য, এটা তাদেরই দায়িত্ব, মহিলাদের সবচে দামী জিনিস হলো তাদের ইজ্জত। তাই নারীকেই হেফাজত করতে হবে তার দামী বস্তু ইজ্জতের। যেমন, আমার কাছে যদি ৫ লক্ষ টাকা থাকে, তাহলে সেটাকে আমিই হেফাজত করবো। অন্য কেউ করবে না। আমার ৫ লক্ষ টাকা যদি এদিক সেদিক ফেলে রাখি, তাহলে চোর বা ডাকাত তার উপর আক্রমণ করবে এবং আমার টাকাগুলো নিয়ে যাবে।

ঠিক নারী যদি তার দামী বস্তু ইজ্জত বা শরীর খোলা রাখে, তাহলে শয়তান ও তার দোসররা, তার ইজ্জত কেড়ে নিবে। যা অহরহ ঘটছে পহেলা বৈশাখে। তাই আমার মা-বোনদের নিকট আকুল আবেদন, আপনি পর্দা করুন এবং খোলা মেলা বেপর্দা চলা-ফেরা থেকে বিরত থাকুন। আমি অনুরোধ করছি আপনাদেরই স্বার্থে, অন্যথায় আপনাকে জ্বলতে হবে জাহান্নামের কঠিন আগুনে; যা সহ্য করা যাবে না। আমার ভাইদেরকে বলবো, আপনার ছেলে-মেয়ে, মা-বোন, স্ত্রীদেরকে অমুসলিমদের পদাঙ্ক অনুসরণ থেকে বিরত রাখুন, অন্যথায় আপনি আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসিত হবেন।

পহেলা বৈশাখে মুসলমানদের বর্জনীয় কাজ

মুসলমান হিসেবে, পহেলা বৈশাখে যে সব কাজ বর্জন করতেই হবে তার কয়েকটি -

১.হিন্দুধর্মের ধর্মীয় প্রতীক, শাখা-সিঁদুরের রঙ্গের পোশাক পরিধান করা বর্জন করতে হবে।

২. হিন্দুদের ধর্মীয় পোশাক, ধুতি, পরিহার করতে হবে।

৩. হিন্দু খ্রিস্টানদের মতো ছেলে-মেয়েদের অবাধ চলা-ফেরা বর্জন করতে হবে।

৪. হিন্দু খ্রিস্টানদের মতো গান বাজনা বাদ দিতে হবে।

৫. হিন্দুদের মতো মূর্তি বানিয়ে মঙ্গলযাত্রা পরিত্যাগ করতে হবে।

৬. ছেলে-মেয়ে একত্রে আহার-বিহার, আনন্দ-ফূর্তি ও বিনোদন বাদ দিতে হবে।

৭. মানুষের হাতে, নিজ অঙ্গে উল্কি এঁকে নেয়া ও দেয়া উভয়ই বর্জন করতে হবে।

৮. অবাধ যৌনাচার, ধর্ষণ, কুদৃষ্টি ইত্যাদি পরিহার করতে হবে।

৯. পান্ড়া-ইলিশ খাওয়া ও হিন্দুদের সাদৃশ্য বর্জন করতে হবে।

১০. জুয়া খেলা, তাস খেলা, অর্ধ উলঙ্গ মেয়েদের দিয়ে নাচ-গান, বিভিন্ন নাইট ক্লাবে নারী-পুরুষের অপকর্ম, মদপান ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী সকল প্রকার কাজ বর্জন করতে হবে।

পহেলাবৈশাখ মুসলমানের রীতিমত পালন না করলে কে ক্ষতিগ্রস্থ হবে?

আগেই উল্যেখ করা হয়েছে আবহমান বাংলার ঐতিহ্যকে কৃষ্টি হিসেবে ফুটিয়ে তোলা নববর্ষের অনুষ্ঠানের লক্ষ্য। তাহলে আবহমান বাংলায় কি শুধু হিন্দুরা ছিল? মুসলমানদের ঐতিহ্য কি আবহমান বংলায় ছিলনা? পার্শ্ববর্তী দেশ আধিপত্যবাদী এটা উপমহাদেশের ভুরাজনীতি থেকে জানা যায়। তা হলে সু কৌশলে বর্তমাণ নববর্ষের কৃষ্টি কি আমাদেরকে আধিপত্যবাদের অনুসারী করে ফেলছে না?

আমাদের ব্যবসায়ী শ্রেণী নববর্ষের বর্তমান আঙ্গিকের অনেক বড় পৃষ্ঠপোষক। মঙ্গল শোভাযাত্রার পিছনের এতো অর্থ কি তারা মুনাফা না করেই দেয়? মুঠোফোন কম্পানি আপনাকে ফ্রি অফার কেন দিচ্ছে? কেন সামাজিক হাইপ তৈরী করছে তারা। উঠতি বয়সের আপনি যৌবনের ছলকে উঠা আকর্ষণে অবাধ মেলা মেশার জন্য উদগ্রীব। আপনার আবেগটাকে ব্যাবহার করে আপনার কষ্টার্জিত অর্থটাকে নিজেদের মুনাফা হিসেবে নিয়ে নেয়াই তাদের উদ্দেশ্য।

আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন ফ্রি এস এম এস এর কয়টি আপনি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধের জন্য ব্যাবহার করছেন। আপনি কয়টি ফ্রি এস এম এস ইভটিজিং এর জন্য ব্যাবহার করছেন? আপনি কয়টি এস এম এস অশ্লীলতাকে ছড়িয়ে দিতে ব্যাবহার করছেন। আপনার ভেতরের নেগেটিভ সত্বাটাকে তাদের প্ররোচনায় উসকে দিয়ে নিজের পয়সা দান করছেন নিজের জাহান্নামের আগুন উসকে দিতে।

নিজের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যায় করছেন পর নারী হারাম ছোওয়ায় উল্কি আকার জন্য। পরনারীর হারাম হাতের স্পর্শে মুখে পান্ড়া ইলিশ খাওয়ার জন্য। আপনার নিজের মায়ের হাতের থেকে ঐ হাতের পান্ড়া ইলিশ কি বেশী উপাদেয়? এই সব কি চরম অশণ্টীলতা নয়।

ফ্যাশন হাউজ গুলো আমার জাতীয় সত্বাকে বিকৃত করে নতুন বারতা আনছে। আর আপনি প্রফুল্য চিত্তে তা ক্রয় করছেন। শুধু একদিনের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানের জন্য আপনি নিজের বোধ টুকু ত্যাগ করে নিজের ব্যক্তিগত গোপনিয়তা হ্রাস করে আব্রু হেফাজত না করে গান বিনোদনী হচ্ছেন। আপনি কিছুই পাচ্ছেন না। বরং নিজের পয়সা খরচ করে সস্ড়া মন্ড়ব্য ও অশণ্টীল ট্রেট মেসেজের বিষয় হচ্ছেন।

যে মেলায় আপনি অংশগ্রহণ করবেন সেই আয়োজনে কি ধরণের চাদা বাজী আর দূর্বৃত্তায়নের অর্থনীতি জড়িত তা কি একবার ভেবে দেখেছেন? মেলায় অংশগ্রহণ কারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের শোষনের উপলক্ষ কি আপনি করে দিচ্ছেন না।

নিজের না বোধক সত্বার টানে আগুনে যেমন আত্মাহুতি দিতে পঙ্গপাল আসে সেই ভাবে একত্রিত হচ্ছেন, আর গণজমায়েতের গরমে গলা ভেজাবার জন্য মাল্টি ন্যশনাল কম্পানির কোমল পানীয় পান করতে ব্যস্ড় হচ্ছেন। কেউ বা বেশী তেষ্টায় বিয়ার, হুইস্কি খাবেন। একবার ভাবুন নিজের পকেটের কষ্টার্জিত এই অর্থ ব্যয় করে আপনি কাদের মুনাফার তেষ্টা মিটাচ্ছেন। আপনাকে কেউ সামনা সামনি বোকা বললে আপনি কি তা মেনে নিবেন বা নেন? গড্ডলিক প্রবাহের এই অন্ধ অসুস্থ অনুকরণে কি আপনি এই বেনিয়ার গোষ্ঠীদারা বোকা প্রমাণিত হচ্ছেন না?

কোন ডিগ্রি নিয়ে কবরে যাব?

আমি ডাক্তার হই, ইঞ্জিনিয়ার হই, বাড়িওয়ালা আর জমিওয়ালা যেই হই না কেন, কোনো পরিচয় বা ডিগ্রি আমার কাজে আসবে না। আমাকে মুসলমানের ডিগ্রি নিয়েই কবরে যেতে হবে। দেখুন, আল্লাহ তাআলা বলেন, "সাবধান অন্য কোনও অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে, বরং এই অবস্থায়ই যেন আসে যে তোমরা মুসলিম।"

-আলে ইমরান: ৩ ঃ ১০২

আল্লাহ আমাদেরকে বলেন, মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ করিও না।

আপনি কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত?

যে কোনো সময় আপনার মৃত্যুর ডাক চলে আসতে পারে, এর জন্য কি আপনি প্রস্তুত আছেন? আপনি কি মৃত্যুর সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করেছেন? আপনি কি তওবা করেছেন? আপনি কি নামায পড়া শুরু করেছেন? আপনি কি অন্যায় কাজ ছেড়ে দিয়েছেন? আপনি কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করছেন? অমুসলমিদের সংস্কৃতি কি ছেড়ে দিয়েছেন? আপনি কি খাঁটি মুমিন হতে পেরেছেন? বা এর জন্য কি চেষ্টা করছেন?

আসুন একটু চিন্ড়া করি এবং আত্মসমালোচনা করি, নিজের জীবনের হিসাব নিকাশ মিলাই। আমি কি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে প্রস্তুত? এ পর্যায়ে একটি হাদিস পেশ করছি, মৃত্যুর পর মুমিনের অবস্থান কোথায় হবে, আর বেঈমানদের কোথায়।

মৃত্যুর পরে মুমিনের সম্মান

হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর সাহাবী বারা ইবনে আযেব রা. বর্ণনা করেন, আমরা (একবার) নবী করীম ﷺ-এর সাথে এক আনসারীর জানাযা নিয়ে কবরস্থানে গিয়েছিলাম। যাওয়ার পর দেখি তখনও কবর তৈরি হয়নি। ফলে রাসুল ﷺ বসে পড়লেন। আমরাও নিশ্চুপ হয়ে অত্যন্ড় আদবের সাথে নীরব-নিস্ড়ব্ধ হয়ে তাঁর আশেপাশে বসে পড়লাম, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। নবী করীম ﷺ-এর হাতে একটিণ্ড কাঠ ছিল। তা দ্বারা তিনি মাটি খুঁড়ছিলেন।

কিছুক্ষণ পর রাসুলুল্লাহ ﷺ মাথা তুলে বললেন, ‘ তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে মুক্তি চাও, দু‘বার কিংবা তিনবার একই কথা তিনি উচ্চারণ করলেন। অতঃপর বললেন, যখন মুমিন (মুসলমান) বান্দার দুনিয়া থেকে যাওয়ার সময় হয়, তখন আসমান থেকে ফেরেশতাগণ তাঁর কাছে আগমন করেন। তাদের মুখমন্ডল সূর্যের ন্যায় সাদা ও উজ্জ্বল এবং তাদের সাথে জান্নাতী কাফন ও সুগন্ধি থাকে। নেককার মুমূর্ষু ব্যক্তির শিয়রে বসে বলে ‘হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহতাআলার ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আসো। ফলে তাঁর রূহ এমন সহজে বের হয়ে আসে, যেমন মশক থেকে পানির ফোঁটা বের হয়ে আসে। মুহূর্তের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ড় অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ রূহটি সেই ফেরেশতার হাত থেকে নিয়ে কাফন পরিয়ে ও সুগন্ধি মেখে আকাশের দিকে ছুটে যান।

উক্ত খুশবু সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘পৃথিবীতে যতই ভাল খুশবু পাওয়া যাক না কেন সেই সুগন্ধির সঙ্গে তাদের তুলনা হবে না।’ তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন- “ ফেরেশতাগণ রূহটি নিয়ে আসামনের দিকে উঠতে থাকেন। বিভিন্ন আসমানে অন্য ফেরেশতাদের সাথে দেখা হলে তাঁরা জিজ্ঞেস করেন, এই পবিত্র রূহটি কার? তখন ফেরেশতাগণ তার সর্বোত্তম নাম উল্লেখ করে বলেন, ‘ইনি অমুকের পুত্র অমুক’। প্রথম আসমানে পৌঁছার পর আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন তাঁরা রূহ নিয়ে উপরের দিকে চলে যান। এভাবে এক এক আসমান অতিক্রম করে সপ্তম আসমানে গিয়ে পৌঁছেন। প্রত্যেক আসমানের ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরবর্তী আসমানে পৌঁছে দিয়ে আসেন।

সপ্তম আসমানে পৌঁছার পর আল্লাহ বলেন, আমার এই বান্দার নাম, ইল্লিয়্যীনে (জান্নাতে) লিপিবদ্ধ করে তাঁকে দুনিয়াতে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি মানুষকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি এবং সেখানেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেব, আবার সেখান থেকেই পুনরায় বের করব। আল্লাহর নির্দেশে রূহকে তাঁর শরীরে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অতঃপর দু‘জন ফেরেশতা তাঁর কবরে আসেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘তোমার প্রতিপালক কে? সে উত্তর দেয়, আমার প্রতিপালক আল্লাহ। পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ধর্ম কি? সে উত্তর দেয়, আমার ধর্ম ইসলাম। পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, এ লোকটি কে, যাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল? সে উত্তর দেয় ‘ইনি আল্লাহর রাসুল (মুহাম্মদ) ﷺ তারপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ‘তুমি দুনিয়া থেকে কি আমল নিয়ে এসেছ? সে উত্তর দেয়, আমি আল্লাহর কালাম পাঠ করেছি এবং আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি ও তাঁর কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

তখন একজন ঘোষণাকারী আসমান থেকে ঘোষণা দিয়ে বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। অতএব তোমরা তাঁর জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তাঁর জন্য জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দাও। সুতরাং তাঁর জন্য জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দেয়া হয়। সেই দরজা দিয়ে জান্নাত থেকে শান্ড়ি ও সুঘ্রাণ আসতে থাকে এবং যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ড় তাঁর কবরকে প্রশস্ড় করে দেয়া হয়। অতঃপর সুন্দর পোশাক পরিহিত, সুগন্ধময় ও অত্যন্ড় সুন্দর চেহারার ব্যক্তি তাঁর কাছে আসে এবং সুসংবাদ জানিয়ে বলে, এটা সেইদিন যা সম্পর্কে তোমাকে ওয়াদা করা হয়েছিল। (তাঁর কথা শুনে মুমিন ব্যক্তি মুগ্ধ হয়ে বলবে) আপনি কে? আপনাকে খুবই সুন্দর দেখা যাচ্ছে। সত্যিই আপনার চেহারা দেখে বলা যায় এবং আপনি সুসংবাদ শুনানোর যোগ্য। সে উত্তরে বলবে, আমি আপনার নেক আমল। তখন সে বলবে হে প্রতিপালক! কিয়ামত কায়েম কর, যেন আমি আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের (জান্নাতের হুর-গেলমান ও নেয়ামত সমূহের) নিকট চলে যেতে পারি।

মৃত্যুর সময় কাফেরের অপমান

যখন কাফেরের মৃত্যুর সময় আসে, তখন আকাশ থেকে কালো চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা চট নিয়ে তার কাছে আগমন করেন এবং লোকটির দৃষ্টি যে পর্যন্ড় যায় সে পর্যন্ড় বসে পড়েন। অতঃপর মালাকুল

মউত (মৃত্যুর ফেরেশতা) আগমন করেন এবং তার মাথার কাছে বসে বলেন, হে অপবিত্র আত্মা! আল্লাহর অসন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আস। মালাকুল মউতের নির্দেশ শুনে রূহ শরীরের ভেতর ছোটাছুটি করতে থাকে, ভয়ে কিছুতেই বের হতে চায় না। ফলে মালাকুল মউত কাবাবের শিককে ভেজা উলের কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করার ন্যায় তার রূহকে (হাতে) তুলে নেন। কিন্তু অন্যান্য ফেরেশতাগণ মুহূর্তের মধ্যে তার হাত থেকে রূহটি নিয়ে চটে জড়িয়ে নেন। পচাঁ-গলা লাশ থেকে যেমন দুর্গন্ধ ছড়ায়, ওই চট থেকে তেমন দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে।

ফেরেশতাগণ রূহটি নিয়ে আকাশের দিকে উঠতে থাকেন। ফেরেশতাদের যে দলের সাথেই সাক্ষাৎ হয়, তারা জিজ্ঞাসা করেন, এটা কোন পাপিষ্ঠের রূহ? জবাবে ফেরেশতা সে ব্যক্তির সবচেয়ে নিকৃষ্ট নামটি উল্লেখ করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুক। অবশেষে ফেরেশতাগণ তাকে নিয়ে প্রথম আসমান পর্যন্ড় পৌঁছে যান এবং আসমানের দরজা খুলতে বলেন। কিন্তু তার জন্য আসমানের দরজা খোলা হয় না যেমন এ সর্ম্পকে আল্লাহ বলেন–

"তাদের জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এবং সূচের ছিদ্র পথে উট প্রবেশ না করা পর্যন্ড় তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"। (অর্থাৎ সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব তেমনই তাদের জান্নাতে যাওয়া অসম্ভব) -সুরা আরাফ-৪০

অতঃপর আল্লাহ বলেন- তার নাম সিজ্জীনে (জাহান্নামে) লিপিবদ্ধ করে দাও। এই নির্দেশের পর তার রূহকে সেখান থেকে ছুঁড়ে ফেলা হবে। অতঃপর নবী করীম ﷺ এই আয়াতটি তেলাওয়াত করেন-

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। অতঃপর পাখিরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বাতাস তাকে কোনো দূরবর্তী স্থানে নিয়ে ফেলল।"-সুরা হজ-৩১

অতঃপর রূহকে আবার নিজের দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন দু'জন ফেরেশতা তার নিকট আসেন এবং তাকে বসিয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন 'তোমার প্রতিপালক কে?' উত্তরে সে বলে, 'আফসোস! আফসোস! আমি তো কিছুই জানি না। তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার ধর্ম কি'? উত্তরে সে বলে আফসোস! আফসোস! আমি বলতে পারি না।' পুনরায় ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই ব্যক্তি কে? যাকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল?' উত্তরে সে বলে, 'আফসোস! আফসোস! আমি জানি না।'

প্রশ্ন-উত্তর শেষ হওয়ার পর আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী আওয়াজ দেয়, 'এই ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে, অর্থাৎ সবকিছুই তার জানা আছে। কিন্তু দুনিয়াতে সে আল্লাহকে রব বলে মানত না, দ্বীনের ওপর চলত না এবং হযরত মুহাম্মদ ﷺ-কে নবী হিসেবে স্বীকার করত না। তার নিচে আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দাও। তখন জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হয়। সেই দরজা দিয়ে জাহান্নাম থেকে গরম বাতাস আসতে থাকে। অতঃপর তার কবরকে সংকুচিত করে দেওয়া হয়। ফলে তার একদিকের পাঁজর অপর দিকের পাঁজরের ভিতর ঢুকে পড়ে। অতঃপর বিশ্রী পোশাক পরিহিত অত্যন্ড় খারাপ চেহারা বিশিষ্ট এক ব্যক্তি তার সামনে উপস্থিত হয়। তার শরীর থেকে সীমাহীন দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে। সে তাকে লক্ষ্য করে বলে, বিপদের খবর শুনে নাও। যেদিন সম্পর্কে তোমাকে ওয়াদা দেওয়া হয়েছিল, এটা সেই দিন। তখন কাফের তাকে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার পরিচয় কি'? বাস্ড়বিকই তোমার চেহারা দুঃসংবাদ শোনানোর উপযোগী।' উত্তরে সে বলে, 'আমি হলাম তোমার অন্যায় কর্ম।' তখন সেই লোক একথা শুনে বলতে থাকবে, 'হে আল্লাহ! কিয়ামত সংঘটিত করো না।'

কাফেরদের সম্পর্কে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, শরীরের রগ সহকারে তাদের রূহ বের করা হয়। আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান ও আসমানের সকল ফেরেশতা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। তার জন্য আসমানের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক দরজার ফেরেশতা আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকেন, যেন তার রূহ আমাদের পাশ দিয়ে উঠানো না হয়।

আমাদের আলোচনায় যা আহ্বান করা হচ্ছে

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অনেকেই মনেকরবেন এতে চরমাভাবপন্ন তার দিকে আহ্বান করা হয়েছে। তাদের জন্য বলছি পবিত্র হাদিসে এসেছে ' তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, যদি সে অত্যচারি হয় তবুও অর্থাৎ তোমার ভাইকে বিরত রাখার চেষ্টা কর অন্যের উপর অত্যাচার করা থেকে। সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মের নিষেধ এই তাগিদেই বইটিতে ইসলামের বিধি নিষেধ সম্পর্কিত তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে। আর যে ভাইয়েরা না বুঝে বা প্রবৃত্তির বশে অসৎ কর্মে লিপ্ত আছেন, তাদের প্রতি ভাই হিসেবে এখানে তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

যাতে করে তারা অসৎ কর্ম ত্যাগ করতে পারেন।

এই বইটিতে নতুন কিছুই সন্নিবেশিত করা হয়নি। সত্যমিথ্যা প্রভেদ কারী আল ফুরকানের তথ্যই তুলে ধরা হয়েছে। যাতে করে সকল আদম সন্ড়ান, সৎ, অসৎ এবং সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে তা সম্পর্কে তথ্য স্বংবলিত সিদ্ধান্ড় গস্থহণ করতে পারে।

মানুষ স্বাধীন বলেই সে পৃথিবীতে অন্যায় করার সাথে সাথে আসমান থেকে পাকরাও হয়না। সে কারও অধীন নয় বলেই নিজে সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করে থাকে এবং এই জন্যই প্রত্যেক মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে পরকালে জবাবদীহি করবে। এই বইটিতে মানুষকে তার স্বাধীন সত্বার দায় সম্পর্কে সচেতন করে সঠিক সিদ্ধান্ড় গ্রহনের আহ্বান জানিয়ে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। কলেমা পড়া মুসলমানদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যে, তুমি নিজে আল্লাহর প্রদত্ত সীমাকে যেনে মেন চলার চেষ্টা কর নিশ্চই আল্লাহ সহায় হবেন। তবে সে যেন অজ্ঞতায় সীমা লঙ্ঘনকারী না হয়ে যায়।

আজ মুসলমানরা সত্য ও শান্ড়ির পথ ছেড়ে, অমুসলিমদের মিথ্যা ও অশান্ড়ির পথ অবলম্বন করছে। পক্ষান্ড়রে অমুসলিমরা এই শান্ড়ির জন্য ইসলাম গ্রহণ করছে এবং ইসলামের ওপর টিকে থাকার জন্য নিজের জানকে উৎসর্গও করছে। নিজের মৃত্যুকে মেনে নিচ্ছে কিন্তু ইসলাম থেকে হটছে না।

এই যুগের বাস্ড়ব একজন নওমুসলিমের ঘটনা আপনাদের সামনে পেশ করলাম, একটি সাক্ষাতকার রুপে। সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেছেন আমার বন্ধু মাওলানা আহমদ আওয়াহ নদবী, অধম (লেখক) সেটা উর্দূ ভাষা থেকে অনুবাদ করেছে। এটি বিভিন্ন পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ ভাই-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার

শুধু ইসলাম কবুল করার অপরাধে আমি আপন ভাতিজী 'হেরা'কে জীবন্ড় আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। জ্বলন্ড় আগুনের গুহা থেকে সে আকাশের দিকে, হাত তুলে চিৎকার করে বলছিল, 'ও আমার আল্লাহ! আপনি এই অগ্নিদগ্ধ হেরাকে দেখছেন তো! হে আল্লাহ! আপনি আমাকে; আপনার হেরাকে ভালোবাসেন তো! আপনি তো হেরা গুহাকে ভালোবাসেন, আর অগ্নিগুহায় পড়ে থাকা এই হেরাকেও ভালোবাসেন তাই না! তবে আমার কোন দুঃখ নেই। আপনার ভালোবাসার পর আমার আর কিছু চাওয়ার নেই। আর কিছুর প্রয়োজন নেই।

আহমদ আওয়াহ : আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলাহি ওয়াবারাকাতুহু।

আব্দুল্লাহ : ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুলাহি ওয়া বারাকাতুহু।

প্রশ্ন : আব্দুল্লাহ ভাই! আপনার সম্ভবত জানা আছে, আমাদের ফুলাত থেকে আরমুগান নামে একটি মাসিক উর্দূ পত্রিকা বের হয়। তাতে কিছুদিন যাবত ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণকারী সৌভাগ্যবানদের সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।

উত্তর : (চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে) আহমদ ভাই! আমার মতো অধম অত্যাচারীর কথা এই পবিত্র ম্যাগাজিনে দিয়ে একে কেন অপবিত্র করতে চাচ্ছেন?

প্রশ্র : না আব্দুল্লাহ ভাই! আব্বু মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব (দা.বা.) বলছিলেন যে, আপনার জীবন আল্লাহর কুদরতের এক আশ্চর্য নিদর্শন। আব্বুর ঐকান্ড়িক আকাঙ্ক্ষা যে, আপনার সাক্ষাৎকার অবশ্যই আরমুগানে প্রকাশিত হোক।

উত্তর : আল্লাহ তাআলা আপনার আব্বুকে দীর্ঘজীবি করুন। আমি

নিজেকে তাঁর শিষ্য ও গোলাম মনে করি। তাই তাঁর আদেশ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। আপনি যা প্রশ্ন করবেন আমি তার উত্তর দিতে প্রস্তুত।

প্রশ্ন : প্রথমে আপনার পরিচয় দিন?

উত্তর. আমি যদি বলি যে, সম্ভবত আমি পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ড় দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে অত্যাচারী ও পাপাচারী, নিকৃষ্ট বরং এর চেয়েও বেশী হিংস্রপ্রাণী এবং সেই সাথে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ। তাহলে এটা হবে আমার প্রকৃত পরিচয়।

প্রশ্ন : এটাতো আপনার আবেগময় পরিচয়। আপনার পরিবার ও বংশ সম্পর্কে কিছু বলুন।

উত্তর : মুজাফফরনগর জেলার বুরহানা থানার (উত্তর প্রদেশ, ভারত) এক মুসলিম রাজপুত (একটি বংশের নাম) সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামের এক গোয়ালের ঘরে মোটামুটি ৪২-৪৩ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করি। আমার খান্দান ছিল ধার্মিক হিন্দু এবং পেশা ছিল অপরাধ প্রবণতা। আমার পিতা ও চাচা একটি দলের নেতা ছিলেন। বংশগতভাবে লুটপাট, নির্যাতন-নিপীড়ন, জুলুম-অত্যাচার আমাদের রক্তের সাথে মিশে ছিলো।

১৯৮৭ ইং সনে মিরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় উপস্থিত ছিলাম। সে সময় আমার পিতার সাথে আত্মীয়-স্বজনদের সাহায্য করি এবং আমরা দুজন কমপক্ষে ২৫ জন মুসলমানকে নিজ হাতে হত্যা করি। অতঃপর মুসলিম বিদ্বেষের আবেগে প্রভাবিত হয়ে 'বজরং' দলে যোগদান করি। ১৯৯০ ইং সনে বাবরী মসজিদ শাহাদতকে ইস্যু বানিয়ে শামেলিতে অনেক মুসলমানকে শহীদ করি।

১৯৯২ ইং সনে বুরহানায় অসংখ্য মুসলমানকে শহীদ করি। এলাকার প্রসিদ্ধ এক বদমাশ; কিন্তু নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিল। তাকে দেখে পুরো এলাকার অমুসলিমরা থর্ থর্ করে কাঁপতো। আমি আমার বন্ধুকে সাথে নিয়ে তাকে গুলি করে দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিই। এই মুসলিম বিদ্বেষের কারণে এই হিংস্র পশু এমন স্বেচ্ছাচারিতাও করেছে, (দীর্ঘক্ষণ ক্রন্দনরত অবস্থায়) মনে হয় এধরনের বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার কথা আকাশের নিচে জমিনের উপর না কেউ শুনেছে না দেখেছে। না ধারণাও করতে পেরেছে (আবার অনেক্ষণ কাঁদতে থাকেন)।

প্রশ্ন : দয়া করে আপনার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে কিছু বলুন।

উত্তর. কুরআন শরীফে ৩০ নং পারায় সুরা বুরূজ নামে একটি সুরা আছে। তার মধ্যে অগ্নিকুন্ডে অধিবাসীদের ব্যাপারে আল্লাহতাআলা বলেছেন যে, 'অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা' (সুরা আল বুরূজ ৪-৫) এই সুরাটি মনে হয় আমার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে। ব্যাস, এতটুকুই যে, তারা আগুনের অধিবাসী এটাই বলা হয়েছে বলুন তো আরবিতে আয়াতটি কী?

প্রশ্ন : قُتِلَ أَصْحٰبُ الأُخْدُوْدِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ 'অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ, অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা;'

(সূরা আল বুরূজ ৪-৫)

উত্তর. যদি বলা হয়, দয়া করা হয়েছে আগুনের অধিবাসীদের উপর, তাহলে এর আরবি কী হবে?

প্রশ্ন : رُحِمَ أَصْحٰبُ الأُخْدُوْدِ

উত্তর : যদি আমার ব্যাপারে কোন আয়াত অবতীর্ণ হতো, তাহলে এমনই হতো যে رُحِمَ أَصْحٰبُ الأُخْدُوْدِ ।

প্রশ্ন :আপনার পুরো ঘটনা বলুন?

উত্তর : হ্যাঁ ভাই! বলছি কিন্তু কোন মুখ দিয়ে বলবো এবং কোন অন্ড়র দিয়ে ব্যক্ত করবো। আমার পাথরের ন্যায় অন্ড়রও এ ঘটনা শোনাতে সাহস পায় না।

প্রশ্ন : তারপরও বলুন, মনে হয় এ ধরনের ঘটনা থেকে অনেক মানুষ শিক্ষা ও নসিহত গ্রহণ করতে পারবে।

উত্তর : হ্যাঁ ভাই! বাস্ড়বেই আমার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা প্রত্যেক হতাশ মানুষের জন্য আশার আলো বয়ে আনবে। ওই দয়াময় আল্লাহ তাআলা যখন আমার মতো অত্যাচারীর উপর এমন দয়া করতে পেরেছেন তাহলে অন্যদের নিরাশ হওয়ার অবকাশ কোথায়? শুনুন তাহলে আহমদ ভাই! আমার একজন বড় ভাই ছিলেন, এত অত্যাচার ও অপরাধের পরও দু'ভাইয়ের মধ্যে অন্ড়হীন ভালোবাসা ছিলো। আমার ভাইয়ের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে ছিলো। আমার কোনো সন্ড়ান নেই। ভাইয়ের বড় মেয়ের নাম ছিল হিরা। সে ছিল অভিনব উন্মাদিনী মেয়ে। অত্যন্ড় আবেগপ্রবণ ছিলো। সে যার সাথে মিশতো; পাগলের মতো মিশতো, যার সাথে শত্রুতা করতো

পাগলের মতই শত্রুতা করতো। কখনো কখনো আমাদের মনে হতো যে, তার ওপর কোন জ্বীন-পরীর আছর আছে। কয়েকজন বড় কবিরাজকেও দেখানো হয়েছে কিন্তু তার অবস্থা যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল।

সে স্কুলে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ড় লেখাপড়া করেছিলো। বড় হয়ে যাওয়ায় তাকে ঘরের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। তার আরও লেখাপড়া করার ইচ্ছা ছিলো। সে পরিবারের কারো অনুমতি ছাড়াই হাই স্কুলের ফরম পূরণ করে। আট দিন পর্যন্ড় মানুষের বাড়িতে কাজ করে ফিস জমায় এবং এর দ্বারা বই-খাতা ক্রয় করে। যখন তাঁর পড়া বুঝে না আসত তখন পড়া বুঝার জন্য পাশের বাড়ির ব্রাহ্মণের মেয়ের কাছে যেতো। ব্রাহ্মণের এক ছেলে ছিলো সন্ত্রাসী। জানি না আমার ভাতিজী হিরাকে সে কিভাবে পটিয়েছে। একদিন রাতে সে হিরাকে ভাগিয়ে বারুতের পাশে এক জঙ্গলে নিয়ে যায়। সেখানে তার গ্রুপের সদস্যরা থাকতো। হিরা তো তার সাথে চলে গেছে কিন্তু সেখানে গিয়ে তার পিতা-মাতার কথা খুব মনে পড়ে এবং সে তার ভুলের উপর অনুতপ্ত হয়। সে চুপে চুপে কাঁদত। সেই দলে ছিল ইদ্রীসপুরের এক মুসলমান ছেলে। একদিন সে হিরাকে কাঁদতে দেখে তার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে সে উত্তরে বলল, আমি অল্প বয়সী মেয়ে। কিছু বুঝতে না পেরে এই ছেলের সাথে চলে এসেছি। কিন্তু আমার মান-সম্মানের ভয় হচ্ছে এবং আমার পিতা-মাতার কথা খুব মনে পড়ছে। হিরার প্রতি ওই ছেলের দয়া হলো এবং সে বললো, আমি মুসলমান। আর মুসলমান তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না। আমি তোমাকে আমার বোন বানাচ্ছি। আমি তোমার ইজ্জত হেফাজত করবো এবং তোমাকে এই জঙ্গল থেকে বের করে নিরাপদে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো। সে তার বন্ধুদেরকে বললো, এই মেয়েটিকে খুব সাহসী এবং পাক্কা মনে হচ্ছে। আর আমাদের দলে দু'একটি মেয়েও দরকার, প্রায়ই প্রয়োজন পড়ে। এখন তাকে আমাদের সাথে রাখার উপায় এই হতে পারে যে, তাকে পুরুষের কাপড় পরিধান করানো হোক। বন্ধুরা তার কথা মেনে নিলো। হিরাকে পুরুষের কাপড় পরিয়ে পুরুষ বানিয়ে দেওয়া হলো এবং সে তাকে সাথে নিয়ে ঘুরাফেরা করতে লাগলো। হিরা দেখতে পেলো ১০-১২ জন মানুষের মধ্যে সেই মুসলমান ছেলেটির আচার-ব্যবহার অন্যদের থেকে পৃথক। সে কথায় পাকা ছিলো এবং মানুষকে ভালো পরামর্শ দিতো। যখন মাল বন্টন হতো তখন গরীবদের জন্য একটি অংশ রেখে দিতো। হীরাকে পৃথক কামরায় শোওয়ানোর ব্যবস্থা করতো এবং রাতে পাহারা দিতো যে,

কোন হিন্দু এদিকে আসে কি-না। যখন কিছুদিন হিরাকে তার সাথে থাকতে দেখলো তখন তাদের বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, সে তাদের দলের সদস্য হয়ে গেছে, তাই তার সাথে পাহারা কমিয়ে দেওয়া হলো।

একদিন সে হিরাকে কোন বাহানায় তার বাড়ি বারুতে পাঠিয়ে দিলো এবং হিরাকে বললো যে, তুমি সেখানে গিয়ে গাড়িতে উঠে আমাদের বাড়ি ইদ্রীসপুর চলে যাবে এবং সেখানে গিয়ে আমার ছোট ভাইকে সব কথা বলবে। তাকে বলবে যে, তোমার ভাই তোমাকে যেতে বলেছে। আর বলবে সে যেন এখানে এসে বলে যে, সেই মেয়েকে বারুত ওয়ালারা সন্দেহবশত পুলিশের হাতে উঠিয়ে দিয়েছে। হিরা এমনই করলো এবং তার ভাই জঙ্গলে এসে বললো, সেই মেয়েকে বারুত ওয়ালারা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। সে তার ভাইকে বলে দিলো, হিরাকে থানায় পাঠিয়ে দাও এবং সেখানে গিয়ে সে বলবে যে, ডাকাতদের একটি দল আমাকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে। আমি কোনো রকম পালিয়ে এসেছি। আমার জীবনের ব্যাপারে ভয় হচ্ছে। হিরা এমনই বললো। বারুত ওয়ালারা বুরহানা থানার সাথে যোগাযোগ করলো। সেখানে পূর্বেই সেই মেয়ে ছিনতাইয়ের রিপোর্ট করা হয়েছিলো। বুরহানা থানা ওয়ালারা মহিলা পুলিশ দিয়ে বারুত নিয়ে এলো। হীরাকে ওই থানা থেকে আমাদের গ্রামে নিয়ে আসা হলো। আমরা তাকে বাড়িতে রাখলাম, কিন্তু এমন খারাপ মেয়েকে রাখিই বা কীভাবে? হিরা বললো, যদিও আমাকে সন্ত্রাসীরা নিয়ে গেছে কিন্তু আমি আমার ইজ্জতকে সংরক্ষণ করেছি। এ কথাটি কারও বিশ্বাস হয়নি। কেউ বিশ্বাস করেনি। শিক্ষিত পরিবার থেকে একটি বিয়ের প্রস্ড়াব এলো। তারা বললো, ডাক্তারি পরীক্ষা করে নিন। আমরা দুই ভাই তাকে পরীক্ষা করাতে বুরহানার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাই। পরিকল্পনা ছিলো, যদি তার ইজ্জত ঠিক থাকে, তাহলে তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। অন্যথায় মেরে নদীতে ভাসিয়ে দেবো।

আল্লাহর মেহেরবানী যে, রিপোর্ট ভালো হয়েছে। তার ইজ্জত সংরক্ষিত আছে। আমরা খুশি মনে তাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। এরপর থেকে সে মুসলমানদের খুব প্রশংসা করতো এবং বারবার একজন মুসলমান ছেলের ভদ্রতার কারণে তার বেঁচে যাওয়ার কথা বলতো। সে মুসলমানদের বাড়িতে যাতায়াত করতে শুরু করে। সেখানে এক মেয়ে তাকে (দোজখ কা খটকা আওর জান্নাত কি কুঞ্জি নামে) একটি বই দেয়। মুসলমানদের বই পড়তে দেখে আমরা তাকে অনেক মারপিট করি এবং বলি যে, সামনে যদি এ

ধরনের বই পড়তে দেখি, তাহলে তোকে জবাই করে ফেলবো। কিন্তু ইসলাম তার মনকে তখন বেষ্টন করে ফেলেছিলো। তার অন্ড়রের অন্ধকার পর্দা খুলে দিয়েছিলো এবং তার অন্ড়রকে আলোকিত করেছিলো। সে এক মুসলমান মেয়ের সাথে মাদরাসায় গিয়ে একজন মাওলানা সাহেবের হাতে মুসলমান হওয়ার পর ঘরে শির্কের অন্ধকারে সে হাঁপিয়ে ওঠে। সে উদাসীন অবস্থায় সময় কাটায়। হাসি-খুশি মেয়েটি এখন এমন হয়ে গেছে যেন তার সব কিছুই বদলে গেছে। জানি না সে কেমন করে প্রোগ্রাম বানিয়েছে। সে আবার বাড়ি থেকে বের হয়ে এক মাওলানা সাহেবের স্ত্রীর সাথে ফুলাত চলে যায়। আহমদ ভাই! আপনাদের এখানেই ছিলো। মনে হয় আপনার মনে আছে!

প্রশ্ন : হ্যাঁ হ্যাঁ হেরাজী! আচ্ছা, এখন ওই হেরাজী কোথায়? আমাদের পরিবার তার ব্যাপারে খুবই চিন্ড়িত। সে তো খুব ভালো মানুষ ছিলো। আচ্ছা! আপনি তাহলে হেরাজীর চাচা?

উত্তর : হ্যাঁ, আহমদ ভাই! আপনার আব্বু তার নাম হেরা রেখেছিলেন। আর সেই নেক বখত মেয়েটির জালেম চাচা হলাম আমিই (কাঁদতে কাঁদতে)।

প্রশ্ন : আগে তো বলুন হেরাজী কোথায়?

উত্তর : বলছি আমার ভাই, বলছি! আমার অত্যাচার ও পশুত্বের কাহিনী মনে হয় আপনার জানা আছে যে, মাওলানা সাহেব (মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেব) সতর্কতাবশত; তাকে দিল্লীতে তার বোনের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং সে সেখানেই থাকতো। ওখানে সে সুন্দর মনোরম পরিবেশ পেয়েছিল। মাওলানা সাহেববের বোনকে রাণী ফুফু বলে সম্মোধন করতো। আপনার আম্মুও তাকে খুব ভালোবাসতেন। তার রাণী ফুফু তাকে অনেক দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন। বোধ হয় সে এক দেড় বছর দিল্লীতে ছিলো। ফুলাত এবং দিল্লীতে অবস্থান করায় সে এমন মুসলমান হয়েছিলো যে, যদি এখন কুরআনে হাকীম অবতীর্ণ হতো; তাহলে আহমদ ভাই শহীদ মেয়েটির নাম নিয়েও আলোচনা হতো। ঘরের লোকদের প্রতি তার খুব ভালোবাসা ছিলো। বিশেষত; তার মায়ের প্রতি। তার মা অধিকাংশ সময় অসুস্থ থাকতো।

এক রাত্রে সে তার মাকে স্বপ্নে দেখে যে, তার মা মারা গেছে। ঘুম ভাঙার পর তার মায়ের কথা খুব মনে পড়লো। যদি তার মা বেঈমান

অবস্থায় মারা যায়, তাহলে কী হবে! এ কথা মনে করে সে কাঁদতে লাগলো। এমনকি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো। বাড়ির সকলেই তাকে সান্ড়না দিলেন। সাময়িকভাবে যদিও সে চুপ হয়ে গেলো। কিন্তু বার বার তার স্বপ্নের কথা মনে পড়তে থাকে। সে আপনার আব্বুর কাছে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি চাইলে আপনার আব্বু তাকে বুঝালেন যে, তোমার পরিবার তোমাকে জীবিত থাকতে দেবে না। এর চাইতেও ভয়ের ব্যাপার যে, তোমাকে আবার হিন্দু বনিয়ে দেবে। ঈমানের ভয়ে সে কিছু দিন থেমে থাকলো। আবার যখন বাড়ির কথা মনে পড়তো তখন বাড়ি যাওয়ার জন্য জিদ করতো।

মাওলানা সাহেব অপারগ হয়ে অবশেষে তাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বলে দিলেন যে, পরিবারকে দাওয়াত দেওয়ার নিয়তে বাড়ি যাবে। বাস্ড়বেই যদি তোমার পরিবারের প্রতি ভালোবাসা থাকে তাহলে সবচাইতে বড় হক হলো, তুমি তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। হেরা বললো, তারা তো ইসলামকে ঘৃণা করে। তারা কখনোও ইসলাম গ্রহণ করবে না। সে বাড়িতে বলেছিলো, মাওলানা সাহেব তাকে বলেছিলেন, আল্লাহতাআলা তাদের অন্ড়রকে ইসলামের জন্য খুলে দেবেন। তাহলে তারা কুফর শির্ককেও ঘৃণা করবে। যেভাবে এখন ইসলামকে ঘৃণা করে। মাওলানা সাহেব বললেন, তুমিও তো এক সময় ইসলামকে ঘৃণা করতে যেভাবে এখন কুফরকে ঘৃণা করো। আল্লাহর কাছে দু'আ এবং আমার কাছে অঙ্গীকার করো যে, তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার পরিবারকে দোযখ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। যদি তুমি এই নিয়তে বাড়ি যাও তাহলে প্রথমত : আল্লাহতাআলা তোমাকে হেফাজত করবেন। আর যদি তোমাকে কষ্টবরণ করতে হয় তাহলে কষ্ট স্বীকার করতে হবে। যা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর আসল সুন্নত। যদি তোমাকে তোমার পরিবার মেরেও ফেলে তাহলে, তুমি শহীদ হয়ে যাবে এবং শাহাদাত জান্নাতের সংক্ষিপ্ত রাস্ড়া। আমার বিশ্বাস যে, তোমার শাহাদাত তোমার পরিবারের হেদায়াতের কারণ হবে। যদি তোমার পরিবারকে দোযখ থেকে বাঁচানোর জন্য তোমার জীবনও দিয়ে দাও এবং তারা হেদায়েত পেয়ে যায়, তাহলে তোমার জন্য সহজ ব্যবসা হবে। মাওলানা সাহেব বলেন, তিনি তাকে দুই রাকাত নামায পড়তে বলেছিলেন এবং তাদের জন্য হেদায়েতের

দু'আ এবং দাওয়াত দেওয়ার নিয়ত করে বাড়ি যেতে বলেছিলেন। তারপর দিল্লী থেকে ফুলাত এবং ফুলাত থেকে সে বাড়ি এলো। তাকে দেখে আমাদের গায়ে আগুন ধরে গেলো। আমি তাকে জুতা দিয়ে মারপিট করলাম। সে এ কথা তো বলেনি যে সে কোথায় ছিলো। তবে বললো, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। এখন আমাকে ইসলাম থেকে কেউ সরাতে পারবে না। আমরা তার উপর কঠোরতা করি আর সে উল্টো কেঁদে কেঁদে আমাদেরকে মুসলমান হতে বলে।

তার মা অসুস্থ ছিলো। দুই মাস পর সে মারা যায়। সে তার মাকে দাফন করানোর জন্য মুসলমানদের ডেকে বলছিল যে, আমার মা আমার সামনে কালেমা পড়েছেন। তিনি মুসলমান হয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। তাই তাকে জ্বালানো-পোড়ানো অন্যায় ও জুলুম হবে। কিন্তু আমরা তাকে কীভাবে দাফন করি। তাকে আমরা জ্বালিয়ে দিলাম। প্রতিদিন এ নিয়ে আমাদের বাড়িতে ঝগড়া-ফাসাদ হতো। সে কখনো তার ভাইকে কখনো তার বাবাকে মুসলমান হতে বলতো। আমরা তাকে তার নানির বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। তার মামা অবশেষে অপারগ হয়ে আমাকে ও ভাইয়াকে খবর দিয়ে বললো যে, এই বিধর্মীকে আমাদের এখান থেকে নিয়ে যান, প্রতিদিন আমরা তার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি। আমি বজরং দলের নেতাদের সাথে পরামর্শ করলাম। তারা মেরে ফেলার পরামর্শ দিলো। আমি তাকে গ্রামে নিয়ে আসি। একটি নদীর কিনারায় পাঁচ ফুট একটি গর্ত খনন করি। আমি এবং আমার বড় ভাই তাকে বোনের বাড়ি নিয়ে যাওয়ার ছলনা করে সে দিকে নিয়ে চললাম।

সে মনে হয় স্বপ্নে জানতে পেরেছিলো। সে গোসল করে নতুন কাপড় পরে আমাকে বললো যে, চাচা! আমাকে শেষ দুই রাকাত নামায পড়তে দিন। দ্রুত নামায আদায় করে বিয়ের কনে সেজে খুশি মনে আমাদের সাথে চলতে লাগলো। লোকালয় থেকে অনেক দূরে এবং রাস্ড়া থেকে অনেকটা সরে আসার পরও সে একটু জিজ্ঞাসাও করেনি যে, আপনার বোনের বাড়ি কোথায়? একেবারে কাছে গিয়ে হেসে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনি কি আমাকে আপনার বোনের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, না মুত্যুর বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন? (অনেক সময় কাঁদতে কাঁদতে)

প্রশ্ন : বস্থায়,) হ্যাঁ ভাই, ঘটনাটি সম্পন্ন করুন।

উত্তর : কোন মুখ দিয়ে সম্পন্ন করবো! হ্যাঁ, শেষ তো করতেই হবে। আমার কাছে একটি ব্যাগে পাঁচ লিটার পেট্রোল ছিলো। হেরার পিতা এবং আমি এই জালেম চাচা দু'জনে সাথে করে সেই সত্য মুমিনা আশেকা শহীদাকে নিয়ে গর্তের নিকট গেলাম। যা একদিন পূর্বে খনন করে রেখেছিলাম। এই হিংস্র চাচা এই বলে তাকে গর্তে ঠেলে দিলো যে, আমাদেরকে নরক বা দোযখ থেকে কি বাঁচাবি! যা নিজেই তার মজা দেখ। গর্তে নিক্ষেপ করে তার শরীরে সমস্ড়পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। আমার ভাই কাঁদতে কাঁদতে সেই গর্তের দিকে তাকিয়ে থাকলো। জ্বলন্ড় ম্যাচের কাঠি তার উপর পড়তেই তার কাপড়ে দাউ দাউ করে আগুন লেগে গেলো।

সে গর্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো এবং জ্বলন্ড় আগুনে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, হে আমার আল্লাহ! আপনি আমাকে দেখছেন না? আমার আল্লাহ! আপনি কি আমাকে দেখছেন না? হে আমার আল্লাহ! আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন না? হ্যাঁ অবশ্যই আপনি 'গারে হেরাকে' ভালোবাসেন। আর গর্তের মধ্যে জ্বলন্ড় হেরাকেও ভালোবাসেন, তাই না? আপনার ভালোবাসার পর আর কোন জিনিসের প্রয়োজন নেই। অতঃপর সে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, পিতাজী! অবশ্যই আপনি ইসলাম গ্রহণ করে নেবেন। চাচাজী! অবশ্যই মুসলমান হয়ে যাবেন (হেঁচকির সাথে কাঁদতে কাঁদতে)। এতে আমি অনেক রাগ করলাম। আমি ভাইয়াকে হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে এলাম। ভাইয়া আমাকে বলতে লাগলেন যে, আর একবার তো তাকে বুঝিয়ে দেখতে। কিন্তু আমি এতে রাগান্বিত হলাম, ফেরার সময় গর্ত থেকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর আওয়াজ শুনতে পেলাম এবং আমরা আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য(!)পালন করে বাসায় চলে এলাম। কিন্তু শেষে এ শহীদার ভালোবাসায় এই জানোয়ারের পাথরের মতো শক্ত আত্মাও ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। আমার ভাই বাড়িতে এসে অসুস্থ হয়ে গেলেন। তার অন্ড়রের একটি ব্যথা স্থায়ীভাবে বসে গেলো। আর এটাই তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো। মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে আমাকে ডেকে বললেন, আমি জীবনে যা করেছি তো করেছি, কিন্তু আমার মৃত্যু হিরার ধর্মের উপর হবে। তুমি কোনো মাওলানা সাহেবকে ডেকে নিয়ে এসো। আমিও ভাইয়ার অবস্থা

দেখে আর স্থির থাকতে পরলাম না, ভেঙে পড়লাম। আমাদের এলাকার ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করে তাঁকে বাসায় নিয়ে এলাম। ভাইয়া তাকে কালেমা পড়াতে বললেন। তিনি কালেমা পড়ালেন। তার মুসলিম নাম রাখলেন আব্দুর রহমান। তিনি আমাকে ইসলামি পন্থায় দাফন করতে বললেন। আমার জন্য এ কাজ অত্যন্ড় কঠিন ছিলো। কিন্তু আমি আমার ভাইয়ের অন্ড়িম ইচ্ছা পূরণ করার জন্য কৌশল অবলম্বন করলাম এবং চিকিৎসার বাহানায় দিল্লীতে নিয়ে গেলাম। এবং হাসপাতালে ভর্তি করলাম। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। অতঃপর আমি হামদর্দের এক ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করি এবং তাকে বিস্ড়ারিত বললাম। তিনি কিছু মুসলমানকে ডেকে তার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করলেন।

প্রশ্ন : আশ্চর্য ঘটনা! আপনি তো আপনার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা এখনও বলেননি?

উত্তর : এটাই বলছি। ইসলাম থেকে তো দুশমনি কমে গেলো। কিন্তু ভাইয়ার মুসলমান হয়ে মারা যাওয়ায় আমার অন্ড়রের দুঃখ-বেদনা ছিলো। ভাইয়া মুসলমান হয়ে মারা যাওয়ার কারণে আমার বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, ভাবিও মুসলমান হয়ে মারা গেছেন। আমার মনে হচ্ছিল যে, কোনো মুসলমান আমাদের বাড়িতে যাদু করে রেখেছে এবং অন্ড়রকে বেঁধে রেখেছে যে, শেষ পর্যন্ড় এক এক করে সকলেই নিজ ধর্ম ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করবে। আমি অনেক কবিরাজের সাথেও আলোচনা করেছি। এক ব্যক্তির খোঁজে শামেলি থেকে আউন যাচ্ছিলাম। বাসে উঠলাম। বাসটি কোনো মুসলমানের ছিলো। ড্রাইভারও ছিলো মুসলমান। সে ক্যাসেটে কাওয়ালি চালিয়ে রেখেছিলো। কাওয়াল ছিল বৃদ্ধ বয়সী। তার মধ্যে আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক বৃদ্ধার খেদমত এবং তার ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনা ছিলো। আর স্পিকারটি ছিলো আমার মাথার উপর। বাস ঝিনঝানায় থামলো। সেই কাওয়ালি ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণাকে পাল্টে দিলো।

আমার মনে হলো, যে নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই ঘটনা মিথ্যা হতে পারে না। আমি আউনে না নেমে ঝিনঝানায় নেমে গেলাম এবং আমার মনে হলো যে, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে হবে। অতঃপর শামেলীর বাসে উঠলাম। ক্যাসেটে পাকিস্ড়ানের মাওলানা হানিফ

সাহেবের ওয়াজ চলছিলো। তাঁর বয়ান ছিলো মৃত্যু ও তার পরের অবস্থা সম্পর্কে। আমার শামেলিতে নামার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু সেই ওয়াজ শেষ হয়নি। শামেলি বাস টার্মিনালে এসে ড্রাইভার ক্যাসেট পেণ্ঢয়ার বন্ধ করে দিলো। আমার বক্তৃতা শোনার খুব আগ্রহ ছিলো। জানতে পারলাম বাসটি মুজাফ্ফরনগর যাবে। তাই বক্তৃতা শোনার জন্য মুজাফ্ফরনগর এর টিকেট কাটলাম। বঘরা গিয়ে বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলো। বক্তৃতাটি আমার ও ইসলামের মাঝে দূরত্ব অনেক কমিয়ে দিলো। আমি বুরহানা রোডের ওপর নেমে গেলাম এবং বাড়ি যাওয়ার জন্য বুরহানার গাড়িতে উঠলাম। আমার পাশেই এক মাওলানা সাহেব বসেছিলেন। আমি তাকে বললাম যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। আপনি কি এ ব্যাপারে আমাকে কিছু সহযোগিতা করতে পারবেন? তিনি বললেন, আপনি ফুলাত চলে যান এবং মাওলানা কালীম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করুন। তাঁর থেকে ভালো মানুষ আমাদের এলাকায় আর পাওয়া যাবে না।

আমি ফুলাতের ঠিকানা নিলাম এবং বাড়ি না গিয়ে ফুলাতে চলে গেলাম। মাওলানা সাহেব ছিলেন না। তিনি পরের দিন আসার কথা ছিলো। রাতে এক মাস্টার সাহেব মাওলানা সাহেবের লিখিত বই 'আপ কি আমানাত আপ কি সেওয়ামেঁ' (আপনার আমানত) এক কপি দিলেন। এই বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ হলাম। মাওলানা সাহেব পরদিন সকালে না এসে রাতে বাসায় ফিরলেন। আমি মাগরিবের পর তার কাছে মুসলমান হওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করলাম এবং বললাম যে, আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে এসেছিলাম কিন্তু 'আপ কি আমানাত আপ কি সেওয়ামেঁ' আমাকে শিকার করে নিয়েছে। মাওলানা সাহেব খুব আনন্দিত হলেন এবং ১৩ জানুয়ারি ২০০০ ইং আমাকে কালেমা পড়ালেন।

আমার নাম রাখলেন আব্দুলাহ। রাতে সেখানেই অবস্থান করলাম এবং মাওলানা সাহেবের কাছে ১ ঘণ্টা সময় নিলাম ও আমার এই নির্যাতনের নির্মম কাহিনী শুনালাম। মাওলানা সাহেব আমার ভাতিজী হেরাকে হত্যা করার কথা শুনে অনেক সময় পর্যন্ড় কাঁদতে থাকেন এবং বললেন যে, হেরা আমাদের এখানেই ছিলো। দিল্লীতে আমার বোনের কাছে থাকতো। মাওলানা সাহেব আমাকে সান্ড়না দিলেন, ইসলাম আপনার পিছনের সমস্ড় গুনাহ মুছে দিয়েছে। কিন্তু আমার অন্ড়র সান্ড়না পাচ্ছিলো না যে, এ

ধরনের হিংস্র অত্যাচারীর ক্ষমা কীভাবে হবে? মাওলানা সাহেব আমাকে বললেন, ইসলাম পিছনের সমস্ড় গুনাহ মুছে ফেলে। আপনি এতগুলো হত্যা করেছেন, এখন আপনার সান্ড্নার জন্য আপনি মুসলমানদের জান বাঁচানোর চেষ্টা করুন। কুরআন বলে যে, সৎ কাজ গুনাহ কে দূর করে দেয়। বর্তমানে আমি আমার মনের সান্ত্বনার জন্য এবং মজলুমের অন্ড়রকে জাগাবার জন্য বিপদগ্রস্থ, নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের সহযোগিতা ও সহ-মর্মিতার চেষ্টা করি। এটা আমার জানা আছে যে, মৃত্যু ও জীবন দেয়ার আমি কে? কিন্তু চেষ্টাকারী তো সম্পাদনকারীর মতই, তাই চেষ্টা করি।

গুজরাটের দাঙ্গা হলো। আমি সেই সময়টাকে গনিমত মনে করলাম। আমার আল্লাহর মেহেরবানী যে, তিনি আমাকে খুব সুযোগ করে দিয়েছেন। সেখানে আমি হিন্দু সেজে অনেক মুসলমানকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছি। অথবা পূর্ব থেকে আশঙ্কা থাকলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছি। প্রথমে গিয়ে হিন্দুদের পরামর্শে শরীক হয়েছি। এভাবে ১০-১১ টি হামলার পূর্বেই খবর দিয়ে তাদের গ্রাম থেকে পালাতে সহযোগিতা করেছি। এ কাজ তো আমার আল্লাহ এমন করিয়েছেন যা আমাকে অনেক সান্ড্না দিয়েছে। আপনি হয়তো শুনেছেন যে, ভাউনগরে এক মাদরাসার ৪০০ ছাত্রকে আগুনে জ্বালিয়ে মেরে ফেলার পরিকল্পনা ছিলো। আমি সেখানে থানা ইনচার্জ মি.শরমাকে খবর দিলাম এবং তাদেরকে প্রস্তুত করলাম। সেই দলটি আসার ১০ মিনিট পূর্বে পিছন দিক থেকে নিজ হাতে দেওয়ালটি ভেঙে দিলাম। আল্লাহতাআলা আমাকে ৪০০ নিষ্পাপ শিশুর জান বাঁচানোর উছিলা বানিয়ে দিলেন।

আমি তিন মাস পর্যন্ড় গুজরাটে অবস্থান করি। তারপরও আমার জুলুম এত বেশি যে, এই সব কিছু তার সমপর্যায়ের নয়। একবার মাওলানা সাহেব সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলার রহমতের জন্য অসুবিধা কী? মৃত্যুর সময় বিভিন্ন বাহানা করে দেন। যেই আল্লাহ তাআলা আপনাকে হেদায়াত দান করেছেন, সেই আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করতে কেন সক্ষম নন? এর দ্বারা কিছুটা চিন্ড়ামুক্ত হই। মাওলানা সাহেব আমাকে ইসলাম শেখার জন্য তাবলীগে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। আমি দু'মাসের সময় নিলাম এবং গ্রামের বাড়ি-ঘর জমি-জমা সস্ড়া দামে বিক্রি করে দিল্লীতে বাসা নেই। আমার স্ত্রী ও দুই ভাতিজা ও হেরার বোনকে প্রস্তুত করে ফুলাতে

নিয়ে কলেমা পড়ালাম। এতে আমার দুই মাসের স্থানে এক বছর লেগে গেলো। তারপর জামা'য়াতে সময় লাগালাম। সর্বদা আমার অন্ড়র এই চিন্ড়ায় ডুবে থাকতো যে, এতগুলো মুসলমান এবং ফুলের মতো শিশুদের হত্যাকারী কিভাবে ক্ষমার উপযুক্ত হতে পারে? মাওলানা সাহেব আমাকে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে বলেছেন। বিশেষ করে সুরা বুরুজ বেশি বেশি পাঠ করতে বলেছেন। এখন আমার সেই সুরাটি অর্থসহ বেশ মুখস্থ আছে। যেমন ১৪০০ বছর আগে আমার আল্লাহ তাআলা কেমন সত্য কথা বলেছেন! আমার মনে হয় যে, অদৃশ্যের প্রজ্ঞাময় জ্ঞানী এতে আমারই ছবি এঁকেছেন।

قُتِلَ أَصْحٰبُ الاُخْدُوْدِ ✡ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ✡ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ✡ وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ .

অর্থ. 'অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা। অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা। যখন উহারা ইহার পাশে উপবিষ্ট ছিল। এবং উহারা মু'মিনদিগের সহিত যাহা করিতেছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। -সুরা বুরুজ-৪-৭

আহমদ ভাই! আপনি এই সুরাটি পড়ুন এবং হেরার কম্পন সৃষ্টিকারী আওয়াজের দিকে একটু লক্ষ্য করুন! (হে আল্লাহ! আপনি কি আমাকে দেখছেন না? আমার আল্লাহ! আপনি কি আমাকে ভালোবাসেন না? হে আল্লাহ! আপনি আপনার হেরাকে অনেক ভালবাসেন না! হেরা গুহা থেকেও আমাকে ভালোবাসেন তাই না! আপনার ভালোবাসার পর আর কারো ভালবাসার প্রয়োজন নেই। পিতাজী! অবশ্যই ইসলাম গ্রহণ করবেন। চাচাজী! অবশ্যই মুসলমান হয়ে যাবেন (হেঁচকির সাথে ক্রন্দনরত)

প্রশ্ন. আল্লাহর শুকরিয়া, আপনি তার কথা মেনে নিয়েছেন। আপনি অত্যন্ড় ভাগ্যবান, এই পথভ্রষ্টতার অন্ধকারকে আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য ইসলাম ও রহমতের কারণ বানিয়ে দিয়েছেন।

উত্তর. আহমদ ভাই! আপনি আমার জন্য দু'আ করবেন। আলাহ তা'আলা যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং আমার দ্বারা এমন কাজ নেন যার দ্বারা আমার মতো জালেমের অন্ড়র তৃপ্ত হয়ে যায়। বাস্ড়বেই কুরআনের এই ফরমানের মধ্যে আমার মতো চিকিৎসাহীন রোগীর অনেক বড় চিকিৎসা রয়েছে। যা ভালো খারাপের মাঝে পার্থক্য করে দেয়।

গুজরাটের দাঙ্গায় কিছু নিষ্পাপ মুসলমানের সাহায্য ও জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করতে পেরেছি ভেবে আমার দিল খুব শান্ড়ি পায়। খোদা হাফেজ!

সাক্ষাৎকার গ্রহণে

মাওলানা : আহমদ আওয়াহ নদভী

মাসিক আরমুগান, ফেব্রুয়ারি ২০০৫ ইং

[বি.দ্র : এ ধরনের আরো অনেকগুলো সাক্ষাৎকার বা ঘটনা জানতে চাইলে পড়ুন, লেখকের অনুদিত গ্রন্থ "ভারতীয় নওমুসলিমদের ঈমান দ্বীপ্ত আত্মকাহিনী 'আলোর পথে'" এই বইয়ে প্রায় ২৫ টিরও অধিক ঈমানদীপ্ত সাক্ষাৎকার আছে, এমনকি যারা বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল তাদের অনেকে এখন মুসলমান, তাদের সাক্ষাৎকার তাদের মুখ থেকে]

সমাপ্ত